

অচিন্ত্যকুমার মুখোপাধ্যায়

পরম পূজনীয়

অচিন্ত্যকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক
শিক্ষাদীক্ষা

প্রাপ্তিস্থান
অথার্স সিণ্ডিকেট
১৩, কলেজ রো; কলিকাতা-৭০০০০৯

PARAMA PUJANIYA

Life Sketches of Five Great writers of Bengal

প্রকাশক ঃ
শিক্ষাদীক্ষা

প্রথম প্রকাশ ঃ
ডিসেম্বর, ১৯৭৬
দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ
ডিসেম্বর, ১৯৭৭
তৃতীয় মুদ্রণ ঃ
মার্চ, ১৯৭৯
চতুর্থ মুদ্রণ ঃ
মার্চ, ১৯৮৩

দাম ঃ
[redacted] টাকা

মুদ্রাকর ঃ
মনোরঞ্জন পান
নিউ জয়কালী প্রেস
৬এ, দীনবন্ধু লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

সূচীপত্র

মহাকবি
মধুসূদন ৫

সাহিত্যসম্রাট
বঙ্কিমচন্দ্র ২০

বিশ্বকবি
রবীন্দ্রনাথ ৩৩

প্রিয়তম লেখক
শরৎচন্দ্র ৪৭

বিদ্রোহী কবি
নজরুল ৬১

অনুশীলনী ৭৬

পরম পূজনীয়

[এক]

অসাধারণ সভা

এমন আর হয়নি কখনও আগে। এক অদ্ভুত সভা ডাকা হয়েছে কলকাতায়। একখানা কবিতার বই লেখার জন্যে দেশবাসীর তরফ থেকে অভিনন্দন জানানো হবে এক কবিকে। দিনটা ১৮৬১ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী অর্থাৎ রবি ঠাকুরের জন্মের তিন মাস আগে।

সন্ধ্যে সাতটা বাজার আগেই কলকাতার যাবতীয় জ্ঞানী গুণী মানী লোকেরা কালীপ্রসন্ন সিংহের বাড়ীকে আলো করে তুলেছেন। ইতিমধ্যে সিংহবাড়ীর ফটকে ঘোড়ার গাড়ী থেকে নামলেন সেই কবি। গায়ের রঙ ছাড়া আর কিছু দেখে বোঝার উপায় নেই যে ইনি বাঙালী। অথচ বাংলা কবিতা লেখার জন্যই তাঁকে আজ সংবর্ধনা জানানো হবে।

গান গেয়ে সুরু হল সভা। অভিনন্দনপত্র পাঠ করার জন্য উঠে দাঁড়ালেন কালীপ্রসন্ন সিংহ—বিরাট জ্ঞানী মানী বলে তাঁর নামডাক—বিশাল সংস্কৃত মহাভারতকে তিনি বাংলায় অনুবাদ করেছেন—দেশের উন্নতির জন্য নানা কাজে দিনরাত রয়েছেন লেগে। আনন্দে-কাঁপা গলায় তিনি বলতে লাগলেন—'বাংলা ভাষার আদি কবি বলে আপনি গণ্য হবেন। পৃথিবীর যেখানে বাংলা ভাষা প্রচলিত থাকবে সেখানকার লোক চিরকাল আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।' বক্তৃতার শেষে হাততালিতে ফেটে-পড়া সভায় কালীপ্রসন্ন ফুলের মালা পরিয়ে দিলেন কবিবরের গলায় ; হাতে তুলে দিলেন উপহার—একটা রূপোর পাত্র।

কে এই সৌভাগ্যবান কবি ? এমন কি কাব্য তিনি লিখেছিলেন—যার জন্যে এত সম্মান এত শ্রদ্ধা তিনি পেলেন ?

এই কবিবরের নাম মাইকেল মধুসূদন দত্ত। 'মেঘনাদবধ' কাব্য রচনার জন্য এই সংবর্ধনা তাঁকে সেদিন জানানো হয়েছিল। বাংলা ভাষায় কবিতা লেখা শুরু হয়েছে মধুসূদনেরও হাজার বছর আগে। তবুও তাঁকে যে আদি কবির সম্মান দেওয়া হল, তার কারণ—আজ যে ধরনের কবিতা আমরা পড়ছি লিখছি তার সুরুটা করে দিয়েছিলেন তিনিই। তাই সত্যি সত্যিই তিনি আমাদের আদি কবি।

রাবণের মত দশ মাথা যাঁর ছিল না, অথচ দশ মাথার শক্তি যাঁর মধ্যে এক হয়েছিল সেই প্রচণ্ড কবিবরের জীবনের কথা আমরা এখন জানব।



মধুর প্রভাত

বড় বড় থাম আর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড খিলেনওয়ালা দত্তবাড়ীর চণ্ডী-মণ্ডপে বসেছে গুরুমশায়ের পাঠশালা। সকাল গড়িয়ে দুপুর আসতেই গুরুমশায় ছাত্রদের খেয়ে আসবার ছুটি দিলেন। যে যার বাড়িতে ছুটল হুটপাট দুদ্দাড় করে। ছুটি হওয়ার সময় হয়েছে দেখে মধুর মা ততক্ষণে সাতটা উনুনে ভাত চাপিয়ে দিয়েছেন; সব থেকে সুসিদ্ধ ভাতটা খাওয়াবেন মধুকে। কিন্তু মধু এলো উল্কার মতো। সাত-

তাড়াতাড়ি স্নান সেরে বসে গেল খেতে। তর সইছে না তার। সেদ্ধ আধ-সেদ্ধ যা পেল চাট্টি মুখে গুঁজে ছুটল আবার পাঠশালায়। অন্য ছেলেরা তখন কেউই এসে পৌঁছয় নি, মধু কিন্তু ডুবে গেছে বই-এর পাতায়। সবার থেকে এগিয়ে চলার ঝোঁক তার।

সারাজীবন ধরেই সবার চেয়ে এগিয়ে চলল সে। একদিন সে হয়ে উঠল বাঙালীর বিস্ময় আর গর্বের মাইকেল। 'মাইকেল' হচ্ছে দেবদূত। মধুর জীবনে ওটা আর ধর্মের চিহ্ন হয়ে থাকে নি, হয়ে উঠেছিল তার সত্যিকারের পরিচয়। দেবদূতেরই মত অসাধারণ সব কীর্তি সে করে গেল একের পর এক। চরিত্রটাও ছিল তার দেবদূতেরই মত নিষ্কলঙ্ক।

সে জন্মেছিল আজ থেকে দেড়শো বছরেরও আগে—১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী—যশোর জেলার সাগরদাঁড়ী গ্রামে। কপোতাক্ষ নদীতীরের এই গ্রামখানি এখন বাংলাদেশের সীমানার মধ্যে।

বাবা রাজনারায়ণ, মা জাহ্নবীর একমাত্র সন্তান ; তার উপর শৈশব থেকেই যেমন মধুর তার স্বভাব তেমনি অতুলনীয় তার বুদ্ধি আর মেধা ; তাই সে সবারই ভারী আদরের। সকল সমবয়সীর সঙ্গেই তার দারুণ ভাব ; ধন মানের গর্ব নেই এতটুকু। পড়াশুনাতেই ডুবে থাকতে তার আনন্দ। পাঠশালার গুরুমশায়ের কাছে শুরু হয়েছিল তার প্রথম পাঠ। মায়ের কাছে বসে সে শুনতো রামায়ণ, মহাভারত, মঙ্গলকাব্য ইত্যাদি পুরোনো কালের কবিতা। সেখপাড়া থেকে মৌলবীসাহেব আসতেন তাকে ফারসী ভাষা শেখাতে। মধুমাখা গলায় সে গাইত সখীসংবাদ গান ; আর সময় পেলে বাড়ীর সামনের সারবাঁধা আমগাছের বাগানের ভেতর দিয়ে, আলোছায়ার আলপনায় পা ফেলে ফেলে, পাখির গান শুনতে শুনতে সে চলে আসত কপোতাক্ষের তীরে। নদীর বুকে ডাল মেলে দেওয়া, ঝুরি নামানো বটগাছের শেকড়ে থাকত বসে। কপোতাক্ষের রোদ ঝলমল স্রোত, পরপারের সবুজ

ক্ষেত, আকাশের নানা রঙের ছবি মনটাকে তার কল্পনার স্বপ্নপুরীতে দিত উধাও করে। এমনি ভাবে কেটে গেল জীবনের প্রথম আটটি বছর। প্রকৃতির শোভা আর কবিতার সুর তার মনটাকে করে দিল স্বপ্নময়।

কলকাতার হাওয়ায়

রাজনারায়ণ দত্ত ছিলেন কলকাতার সদর আদালতের ডাকসাইটে উকিল। বাড়ী কিনেছিলেন খিদিরপুরে। আট বছরের মধুকে তিনি নিয়ে এলেন নিজের কাছে, ভালো করে মানুষ করার জন্য। প্রথমে তাকে ভর্তি করলেন বাড়ীর কাছে এক সাহেবী স্কুলে। লেখাপড়ায় চৌকস মধু এখানে চার বছর পড়ে ইংরেজী বলায় লেখায় সাহেবদেরও হার মানিয়ে দিতে লাগল। সাহেব ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিশে তার মনের গড়নটাও গেল বেশ খানিকটা পাল্‌টে। ওদের শক্তি, সাহস আর স্বাধীন ভাব আকৃষ্ট করল তাকে।

তের বছর বয়সে বাবা তাকে ভর্তি করলেন হিন্দু কলেজে। সে কলেজ তখন ইংরেজী ভাষা সাহিত্য জ্ঞান বিজ্ঞান শেখার সেরা কলেজ। বাংলার সেরা ছেলেরা তারার মতো ঝলমল করছে সেখানে; মধুর আগমন যেন সে-আকাশে ধ্রুবতারার উদয়। ছয় বেহারার পালকীতে চড়ে দু'জন পরিচারক নিয়ে সে আসে কলেজে।—বড় বড় টানা টানা দুটো চোখ, টিকলো নাক, চওড়া কপাল; প্রতিভার জ্যোতি ঠিকরে পড়ছে তার কোমল মুখখানা থেকে। দুদিনে সবারই প্রিয় হয়ে উঠল সে। গল্পে, গানে, তর্কে, আবৃত্তিতে মাতিয়ে রাখে সকলকে। না চাইতেই মা তার পকেট ভরে দেন টাকায়। আর দু'হাতে সে তা খরচ করে বন্ধুদের খাওয়াতে, এটা ওটা দিতে। তার প্রাণ-উজাড় ভালবাসা, অমায়িক ব্যবহার ও উদারতায় সবাই মুগ্ধ।

পড়াশুনোতেও তার মনোযোগ দারুণ। তবে পাঠ্য বই-এর থেকে

বাইরের বই-ই সে পড়ে বেশী ; বাড়ীতে দিনরাত ডুবে থাকে বইয়ের স্তূপে। ক্লাসের পড়াতে ফাঁকি দিয়েও সে সেরাদেরই একজন। ভর্তি হয়েছিল স্কুল বিভাগের সর্বোচ্চ শ্রেণীর পাঁচ ক্লাস নীচে। পরীক্ষার ফল এতই ভাল যে ক্লাসের পর ক্লাস টপকিয়ে তার কলেজ বিভাগে উঠে আসতে বেশী দিন লাগেনি। এখনকার—স্কুলের প্রথম শ্রেণী থেকে কলেজের বি-এ ক্লাস পর্যন্ত বারো তেরো বছরের পড়া সে পড়ে ফেলেছিল ছ' বছরেই। তবে অংক সে কষতে চাইত না ; বলত একটা বোকাও পারে অংক কষতে।

তার মন কেড়ে নিয়েছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ ডি. এল. রিচার্ডসন। তিনি ছিলেন মনেপ্রাণে কবি ; কবিতা লিখতেন, পত্রিকা বের করতেন ; আর কবিতা পড়াতেন তিনি যাদুকরের মতো। সে পড়ান শুনতে শুনতে ছাত্রদের মন তলিয়ে যেত স্বপ্নের রঙিন আকাশে, কল্পনার গহীন গাঙে। সাগরদাঁড়ীর স্বপ্নবিভোর মধুকে পেয়ে বসল এই কবিতার নেশায়। সেক্সপীয়র, বায়রন, মিলটন ইত্যাদি ইংরেজ কবিদের কবিতার মধ্যে সে গেল ডুবে। তারপর একদিন সে নিজেই লিখতে আরম্ভ করল ইংরেজী কবিতা। বয়স তখন তার চৌদ্দ পনের।

কবিতার নেশায়

কবিতা আর কবিতা। কবিতাই হয়ে উঠল মধুর ধ্যান জ্ঞান। দিনরাত একেবারে তপস্বীর মতো সে কবিতা পড়া আর লেখার মধ্যে আছে মগ্ন। কিছুদিনের মধ্যেই তার কবিতা ছাপাও হতে থাকল কলকাতার ইংরেজী পত্রপত্রিকাগুলোয়। নামকরা পত্রিকাগুলিও লুফে নিতে থাকল তার কবিতা। কবিতায় মসগুল মধু কলেজে বন্ধুদের নিয়ে একটা হাতে লেখা পত্রিকাও বের করল। প্রায় প্রতিদিন কলেজের বন্ধুদের সে অবাক করে দিত পত্রিকায় ছাপা তার নতুন নতুন কবিতা শুনিয়ে। কবি বলে সে বিখ্যাত হ'ল কলেজে।

কবিতার মধ্যে ডুবে থাকতে থাকতে কবি হওয়াই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলে ঠিক করে ফেলল মধু। তা বলে 'কদর্য' বাংলা ভাষায় কবিতা লিখবে না সে, সে হবে ইংরেজীর কবি। বন্ধুদের সে বলত—'আমি হব মহাকবি আর তোমরা লিখবে আমার জীবনী।' কিন্তু ইংরেজী ভাষায় ভাল কবি হতে হলে ইংরেজদের দেশটাতে তো যাওয়া চাই। সেক্সপীয়র মিলটন বায়রনের মত কবিরা যে দেশে জন্মেছেন সে-দেশ তো কবিতার তীর্থস্থান। এ-তীর্থে যেতে তাকে হবেই। কিন্তু কি করে সে যাবে? বাধা যে অনেক। হিন্দুধর্মে তো সাগর পেরুলেই জাত যায়। তাই বাবা মা তাঁদের নয়নের মণি—একমাত্র সন্তানকে তো কিছুতেই যাওয়ার অনুমতি দেবেন না। তাহলে কি করবে সে? ভাবতে ভাবতে সে মনে মনে ঠিক করে ফেলে—কুসংস্কারে ভরা এই হিন্দু ধর্মটাই ছেড়ে দেবে সে,—হবে খৃষ্টান। কবিতার জন্যে না-হয় বাবা মাকে ছাড়তে হবে। কি আর করা যাবে!

গোপনে গোপনে সব ব্যবস্থাই করে ফেলে মধু। কলেজের শেষ পরীক্ষা দেবার যখন আর এক বছর বাকী তখন একদিন সে উধাও হ'ল কলেজ থেকে। শোনা গেল—খৃষ্টান হওয়ার জন্য পাদ্রীদের কাছে সে আশ্রয় নিয়েছে। দুঃখে রাগে পাগলের মত হয়ে গেলেন রাজনারায়ণ। পাদ্রীদের কবল থেকে মধুকে ছিনিয়ে আনার জন্যে লাঠিয়াল আনালেন যশোর থেকে। ভয় পেয়ে ইংরেজরা মধুকে নিয়ে রাখলো ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে—সৈন্য পাহারায়। কয়েকদিন পর মহা সমারোহে খৃষ্টধর্মে দীক্ষা নিয়ে মধু হ'ল মাইকেল মধুসূদন দত্ত। খৃষ্টান হল, কিন্তু বিলেত যাওয়ার কোন ব্যবস্থাই করল না পাদ্রীরা। নিশ্চিন্ত সচ্ছল জীবন থেকে মধু স্বেচ্ছায় ঝাঁপ দিল অজানা অস্থির সাগরে। হাতে পয়সা নেই, থাকার আশ্রয় নেই, হিন্দু কলেজের দরজাও খৃষ্টান ছেলের জন্য বন্ধ।

কিছুদিন কাটল পাদ্রীদের বাসায় বাসায়। এদিকে ঘরছাড়া মধুর

জন্য মা তো কেঁদে কেঁদে আকুল। বাবারও রাগ পড়ে গেল ধীরে ধীরে। মায়ের ডাকে মধু মাঝে মাঝে আসতে লাগল বাড়িতে। বাবাই ব্যবস্থা করে দিলেন নতুন কলেজে পড়ার, হস্টেলে থাকার। মধু ভর্তি হল শিবপুর বিশপস্ কলেজে। খৃষ্টান ছেলেদের পড়ার খুব ভাল কলেজ সেটা; নানা ভাষা শেখাবার উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা সেখানে। মধু এখানে গ্রীক, ল্যাটিন, সংস্কৃত, ফারসী, তামিল ইত্যাদি ভাষাগুলি শিখতে লাগল। বিশপ্‌সেও সেরা ছাত্র সে। এখানকার লাইব্রেরীটা যেন জ্ঞানের খনি। মধু সেখানেই ডুবে রইল দিনরাত।

কিন্তু হঠাৎ একদিন বাবার রাগ আবার মাথাচাঁড়া দিয়ে উঠল। তিনি দিলেন মধুর মাসোহারা বন্ধ করে। মধু হয়ে পড়ল নিঃসহায় নিঃসম্বল। কিন্তু টাকা পয়সা সুখ স্বাচ্ছন্দ্য—কোন কিছুর জন্য মাথা নোয়াতে জানে না মধু। কোন কিছুতেই ভয় খাওয়ার ছেলে সে নয়।

মাদ্রাজ বিজয়

নিজের যা কিছু সব বিক্রী করে কয়েকজন মাদ্রাজী সহপাঠীর সঙ্গে মাইকেল মধুসূদন চড়ে বসলেন জাহাজে। কাক পক্ষীও জানল না—কোথায় তিনি উধাও হলেন। ট্রেন মোটরের আগের দিনের মাদ্রাজ অতি দূর দেশ। বাংলার সঙ্গে তার কোন যোগাযোগই নেই। সেই দূর বিদেশেই ছাউনি ফেললেন মধুসূদন। সবাই অচেনা সেখানে, কিন্তু তারই মধ্যে নিজেকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করে ফেললেন কিছুদিনের ভেতরেই। জ্ঞান বিদ্যা আর অমায়িক স্বভাবের জন্য মাদ্রাজবাসীরা তাঁকে কাছে টেনে নিল। মধু ইংরেজী শিক্ষকের চাকরী পেলেন এক সাহেবী স্কুলে। ওখানকার ইংরেজী কাগজগুলোতে তিনি নিয়মিত কবিতাও লিখে চললেন। পত্রিকার কবিতাগুলিকে এক করে যখন 'ক্যাপ্‌টিভ্ লেডী' বই বের হল তখন পত্রিকায় পত্রিকায় ধন্যি ধন্যি পড়ে গেল তাঁর। মাদ্রাজের সেরা স্কুল তাঁকে ডেকে চাকরি দিল।

একটা খবরের কাগজ তাঁকে সহ-সম্পাদকই করে নিল। এক ধনী মানী ঘরের সাহেবকন্যা তাঁকে বিয়ে করার জন্য পাগল হলো। রেবেকা ম্যাক্‌টাভিস্‌কে বিয়ে করে মধু সংসার পাতলেন মাদ্রাজে।

এবার নতুন জীবনের খবর পাঠালেন মধু তাঁর কলকাতার বন্ধুদের; 'ক্যাপ্‌টিভ্‌ লেডী' কলকাতাতে এলো। মা পেলেন ছেলের খবর; প্রিয় পুত্রকে তিনি খাবারদাবার পার্সেল করে পাঠালেন। মধু আবার ভাসলেন আনন্দ সায়রে; লেখাপড়ায় মেতে উঠলেন পাগলের মতো। সকাল ৬টা থেকে ৮টা পর্যন্ত পড়েন হিব্রু ভাষা; ৮টা থেকে ১২টা পর্যন্ত স্কুলে পড়িয়ে আবার ২টা থেকে ৫টা পর্যন্ত শেখেন তেলেগু আর সংস্কৃত, ৫টা থেকে ৭টা পর্যন্ত পড়েন ল্যাটিন, সন্ধ্যে ৭টা থেকে ১০টা পর্যন্ত চলে ইংরেজী পড়া ও লেখা। বাংলা একেবারেই ভুলে যাচ্ছেন দেখে কলকাতা থেকে বাংলা রামায়ণ মহাভারত আনিয়েও পড়তে থাকেন।

পুত্র কন্যা নিয়ে মধু সুখে সংসার করছেন মাদ্রাজে। যশ, মান, প্রতিপত্তি অঢেল। কেবল মায়ের মৃত্যুর পর কলকাতার সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ তিনি নিজেই ছিঁড়ে ফেলেছেন। বন্ধুদের চিঠির কোন উত্তরই দেন না। মাকে হারিয়ে মনের যন্ত্রণায় কলকাতাকে ভুলে যেতে চাইলেন। কিন্তু মধুর জীবনে সুখ তো স্থায়ী হয় না; বারে বারে দুর্যোগ এসে সুখের সাগরকে যে মরুভূমি করে দিয়ে যায়। এবারও হল তাই। রেবেকা পুত্র কন্যা নিয়ে তাঁকে ছেড়ে চলে গেলেন। মধুর আয় কম না হলেও অঢেল তো নয়—ধনী নীলকর সাহেবের মেয়ের মন হয়ত তাতে ভরে নি। সাহেবসমাজও মধুর উপর ক্ষিপ্ত হল। স্কুলের চাকরীটাও চলে গেল। পত্রিকার সহ-সম্পাদকের কাজ করে কোনরকমে দিন চলতে লাগল।

এই ভরা দুর্যোগের মাঝে পাঁচ বছর বাদে আবার এলো বন্ধু গৌর-দাসের চিঠি। এক বছর আগে মারা গেছেন রাজনারায়ণ দত্ত। পিতার

সেই মৃত্যু সংবাদ পেলেন এই চিঠি থেকে। মধুর মনে হল—সংসারে তাঁর আর কেউ নেই, সব শূন্য হ'ল। গৌরদাসের বিশেষ অনুরোধে মধু রওনা হলেন কলকাতায়।

বাংলায় মধু

খিদিরপুরের বাড়ীতে ঢুকে দেখলেন বাল্যের সেই আনন্দনিকেতন আজ শ্মশানের মত খাঁ খাঁ করছে। মাথা নত করে সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন। বহুদিন পরে কাছে পেয়ে বন্ধুরা তাকে বুকে তুলে নিলেন। পুলিশ আদালতে একটা কেরানীর কাজ তাঁরাই জুটিয়ে দিলেন। কিছুদিন বাদে পেলেন লালাবাজারের পুলিশ আদালতে দোভাষীর চাকরী।

গুণবতী ইংরেজ রমণী এমিলিয়া সোফিয়া হেনরিয়েটাকে বিয়ে করে মধু নতুন সংসার পাতলেন চিৎপুর রোডে। আয় তো যথেষ্ট নয়, তাই ওকালতি করার বাসনা নিয়ে মধু এবার মগ্ন হলেন আইন পড়ায়।

এরই মধ্যে বন্ধু গৌরদাস একদিন এলেন 'রত্নাবলী' নাটক ইংরেজীতে অনুবাদ করাতে। বেলগাছিয়াতে স্টেজ বেঁধে রত্নাবলীর বাংলা অনুবাদ অভিনয় করবেন পাইকপাড়ার রাজারা। সে এক এলাহি কাণ্ড! কলকাতার সব জ্ঞানী-গুণী লোকেরা অভিনয় করছেন। ছোটলাট ইত্যাদি সাহেব-সুবোরাও আসবেন অভিনয় দেখতে; নাটকটাকে ইংরেজী করে তাঁদের হাতে আগেভাগে না দিতে পারলে তাঁরা তো বুঝবেন না কিছুই। মধু কয়েকদিনের মধ্যেই অনুবাদ করে দিলেন। বাঙ্গালী যে এত ভাল ইংরেজী লিখতে পারে সাহেবরা তা ভাবতেই পারেনি। রাজাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেল মধুর। রত্নাবলীর রিহার্সালেও তিনি যেতে লাগলেন।

একদিন মধু আফশোষ করে গৌরদাসকে বললেন—'এই একটা বাজে নাটক অভিনয়ের জন্য রাজারা এত হাজার হাজার টাকা খরচ

করছেন!' গৌর বললেন—'বাংলায় ভাল নাটক থাকলে কি আর রাজারা এই নাটক করেন!' মধু হঠাৎ বলে বসলেন—'আমিই লিখব ভাল নাটক।' গৌর অবিশ্যি জানেন—মধু যা বলে তা করে, তবু তিনি এ কথাটায় খুব একটা বিশ্বাস করলেন না। ছাত্রজীবন থেকেই তো তিনি দেখছেন মধুকে। মধু তখন বলতেন—এই কদর্য বাংলা ভাষাটা ভুলে যাওয়াই ভালো। এমন কি পৃথিবী বানানটা পর্যন্ত তিনি শুদ্ধ করে লিখতে পারতেন না। মাদ্রাজে অনেকবার চিঠি লিখে গৌর তাঁকে বাংলায় লিখতে অনুরোধ করেছেন। এমন কি বেথুন সাহেব পর্যন্ত তাঁকে বাংলায় লিখবার অনুরোধ করেছেন। তবুও মধু এক কলমও বাংলায় লেখেন নি; এমন কি চিঠিপত্র পর্যন্ত না।

মধুর কিন্তু যে কথা সেই কাজ। পরদিনই লাইব্রেরী থেকে রাশিকৃত বাংলা ও সংস্কৃত বই আনিয়ে লেগে গেলেন পড়তে। কিছুদিনের মধ্যেই 'শর্মিষ্ঠা' নাটক লিখে দিয়ে এলেন গৌরদাসের হাতে। বন্ধুরা তো আনন্দে আত্মহারা! এতদিন পরে এ যে সত্যিকারের নাটক! রাজারা টাকা খরচ করে ছেপে ফেললেন সঙ্গে সঙ্গে। ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত হ'ল বাংলায় সত্যিকারের প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা'। বেলগাছিয়া নাট্যশালায় জাঁকিয়ে অভিনয় হ'ল। নাটক যে পড়ল, অভিনয় যে দেখলো সে-ই প্রশংসায় পঞ্চমুখ। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে মধু প্রথম হাত দিলেন বাংলায়, আর হাত দেবার সঙ্গে সঙ্গে জয় করে ফেললেন তাকে।

রাজারা অনুরোধ করলেন—এবার একটা হাসির নাটক লিখে দিন। মধু লিখে ফেললেন দু'দুটো প্রহসন—'একেই কি বলে সভ্যতা' আর 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'। না, কেবল হাসি না; হাসতে হাসতে চাবুক মারা—দু'কলম ইংরেজী পড়া উচ্ছৃঙ্খল বাবুদের আর কপালে তিলক কাটা বজ্জাত জমিদারদের। এ যে আরো চমৎকার! নানা

ধরনের মানুষের আঁতের কথা একেবারে টেনে বের করেছেন মধু। এমন বই আজও বোধহয় লেখা হয় নি বাংলায়।

কি প্রচণ্ড শক্তি আর দারুণ অধ্যবসায়! বাংলায় লিখবেন ঠিক করার সঙ্গে সঙ্গে মধু সংস্কৃত পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্নকে মাইনে করে রেখে যাবতীয় সংস্কৃত কবিতা, নাটকের বই পড়ে চলেছেন। ল্যাটিন, গ্রীক ভাষা পড়াও চলেছে নিয়মিত। রোজ চার পাঁচ ঘণ্টা ধরে আইনের বই পড়ছেন। এদিকে অফিস তো আছেই। তাছাড়া বাবার সম্পত্তি উদ্ধার করার জন্য মামলাও লড়তে হচ্ছে। আর তারই মধ্যে লিখে চলেছেন বই-এর পর বই। এ শক্তির তুলনা নেই, এ প্রতিভার সমকক্ষ নেই!

কবিতার নবজন্ম

বেলগাছিয়ার বাগানবাড়ীতে রিহার্সাল সুরু হবে একটু বাদেই। অভিনেতারা আসছেন একে একে। ফরাসে গা এলিয়ে মধু গল্প করছেন বন্ধু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে। কথায় কথায় মধু বললেন—'অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখতে না পারলে বাংলা কবিতা বা নাটকের উন্নতি করা যাবে না।' যতীন্দ্রমোহন একটু হেসে বললেন—'কিন্তু সেটা তো অসম্ভব। অমন উন্নত যে ফরাসী ভাষা তাতেই হল না, আর বাংলা তো কোন ছার!' গম্ভীর কণ্ঠে মধু বললেন—'না, অসম্ভব নয়, আমিই লিখব অমিত্রাক্ষর ছন্দে'। অবিশ্বাসী যতীন্দ্রমোহন বাজীই ধরে বসলেন—'তাহলে আমিই নিজের খরচে ছাপব সে কাব্য।'

মধু আবার প্রমাণ করলেন যে মিথ্যা অহমিকা তাঁর নেই। কয়েক দিন পরেই অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'তিলাত্তমাসম্ভব কাব্যে'র খানিকটা লিখে দিয়ে এলেন যতীন্দ্রমোহনের কাছে। বিস্ময়ে সবাই হতবাক্। অসম্ভবকে সম্ভব করল মধু! ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে যতীন্দ্রমোহনই ছেপে বের করলেন 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'। বাংলা কবিতার জন্ম হ[illegible]ন করে। তবু

প্রথম লেখায় মন উঠল না। আবার কলম ধরলেন অমিত্রাক্ষরে। লিখলেন—'মেঘনাদবধ' মহাকাব্য। চমকে উঠল বাঙলী জাত। সে কি কলমের দাপট! আধমরা ভাষা যেন দাপিয়ে উঠে হৈ হৈ করে ছুটতে লাগল। কি ভাবে, কি ছন্দে—মধু ভোল পালটে দিলেন বাংলা কবিতার।

এর পরেও মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখলেন 'বীরাঙ্গনা' কাব্য; লিখলেন 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্য। নাটকও লিখলেন আরো দু'খানা—'পদ্মাবতী' আর 'কৃষ্ণকুমারী'। এই সময় মধু এমন আর একটি কাজ করলেন যা ক্ষেপিয়ে তুলল সাহেবদের। এক রাতের মধ্যে তিনি ইংরেজীতে অনুবাদ করে দিলেন দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকখানা। তা পড়ে বিদেশের লোক নীলকর সাহেবদের বর্বর অত্যাচারের কথা জেনে ফেলেছিল। ইংরেজ সরকার অসন্তুষ্ট হয়েছিল মধুর উপর।

নতুন জীবনের সন্ধানে

মাত্র সাড়ে তিন বছর! এই সাড়ে তিন বছরের মধ্যে একটা প্রচণ্ড ভূমিকম্পের মতো মধু ওলট পালট করে দিলেন বাংলা সাহিত্যকে। তার চেহারা ছবি পালটে দিয়ে তাকে একেবারে নতুন করে তুলে এবার কলম থামালেন মধু! যশ, মান, ভালবাসা, বন্ধু, অর্থ কোন কিছুর আর অভাব নেই তাঁর। বাবার বিরাট সম্পত্তিও পেয়েছেন হাতে।

তাই নতুন জীবনের তৃষ্ণা আবার জেগে উঠেছে তাঁর মনে। মধু শুরু করলেন বিলেতে যাবার তোড়জোড়। আঠারো বছর বয়সের স্বপ্নকে সফল করতে লেগে গেল আরো বিশটি বছর। জীবনের লক্ষ্যও এতদিনে গেছে পালটে। ইংরেজী ভাষায় কবি হবার জন্য নয়, ব্যারিস্টার হওয়ার জন্যে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে মধু চলে এলেন বিলেতে। পড়া, ভ্রমণ, জ্ঞানী-গুণীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় আনন্দ স্ফূর্তিতে দিব্যি কাটতে লাগল বিলেতের দিনগুলি। কিন্তু অকস্মাৎ আবার নেমে এল দুর্যোগ। সম্পত্তির

আয় থেকে টাকা পাঠানোর কথা যাদের তারা বন্ধ করে দিল টাকা। স্ত্রী ছেলেমেয়ে নিয়ে বিদেশে অনাহারের সামনে এসে দাঁড়ালেন মধু।

নানাকারণে চলে আসতে হ'ল ফরাসী দেশে। সেখানে এসে জিনিসপত্র যা ছিল একে একে সব বিক্রি করে বা বন্ধক দিয়ে দিলেন। তার পরে ছেলেমেয়েকে খাইয়ে নিজেরা অনাহারে থাকতে লাগলেন। অবধারিত মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে অবশেষে চোখের সামনে ভেসে উঠল একটি মুখ। সে মুখ করুণাসাগর বিদ্যাসাগরের। বিপদের কথা জানালেন তাঁকে। বিদ্যাসাগর অস্থির হয়ে উঠলেন; টাকা পাঠাতে লাগলেন ধার কর্জ করে; মধুর বিদেশবাসের পুরো দায়িত্ব তুলে নিলেন নিজের কাঁধে। সাড়ে চার বছর বিদেশে কাটিয়ে মধু দেশে ফিরলেন ব্যারিস্টার হয়ে। ছেলেমেয়েকে ভালভাবে শিক্ষা দেবার জন্যে রেখে এলেন ফ্রান্সে। ফরাসী দেশে চরম দুর্যোগ দুর্ভোগের মধ্যেও মধুসূদনের লেখাপড়া কিন্তু বন্ধ হয়নি একদিনের জন্যেও। শিখেছেন নতুন তিন তিনটি ভাষা—ফরাসী, ইতালিয়ান, জার্মান। লিখে গেছেন একের পর এক চৌদ্দ লাইনের নিটোল কবিতা—ইংরাজীতে তাকে বলে সনেট।

কবি মধুসূদন তেতাল্লিশ বছর বয়সে কলকাতার হাইকোর্টে এসে ঢুকলেন ব্যারিস্টার মধুসূদন দত্ত হয়ে। সেখানে সকলেই তাঁকে সমীহ করেন। জ্ঞানে পাণ্ডিত্যে বিচারকরাও যে তাঁর কাছে সব শিশু। আয় করতে লাগলেন মাসে দেড় হাজার দু'হাজার টাকা। দু'বছর রইলেন প্রিন্সেপ হোটেলে। স্ত্রী ছেলেমেয়ে দেশে ফিরলে বাসা করলেন লাউডন স্ট্রীটে। বিপুল উদ্যমে করে চলেছেন কাজ। বাংলার কোর্টে কোর্টে তাঁর মামলা। যেখানেই যান দলে দলে লোক আসে তাঁকে দেখতে। রাজার হালে চলছে দিন। বন্ধুবান্ধবের আনাগোনা আর ভোজসভার বিরাম নেই। দানধ্যানেও সদাই মুক্তহস্ত। তিন বছর ব্যারিস্টারী করার পর পেলেন বিরাট সরকারী চাকরী। মাসে হাজার বারোশ' টাকা আয়;

কিন্তু খরচ তাঁর যে আরও বিরাট, তাই কুলোয় না। এদিকে শরীরেও হঠাৎ ধরল ভাঙ্গন। অসুস্থ অবস্থায় বিছানায় বসে বসে হোমারের মহাকাব্য ইলিয়াডকে বাংলা করে গদ্যে লিখলেন 'হেকটরবধ' গ্রন্থ। কিছুদিন পর আয় বাড়াবার জন্যে চাকরী ছেড়ে আবার এলেন ব্যারিস্টারীতে।

নিষ্ঠুর সন্ধ্যা

কিন্তু গলায় হয়েছে ক্ষত; যন্ত্রণা প্রচণ্ড; মাঝে মাঝেই শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। কোর্টে যেতে পারেন না। বাড়ে অভাব, বাড়ে দেনা, তবুও মনের জোর অটুট। যখন সুস্থ থাকেন হাসিতে আলাপে হীরের মত ঝক ঝক করে ওঠেন। কোর্টে যেতে পারলে অভাব থাকে না টাকার; দেদার খরচ করেন; কেউ সাহায্য চাইলে মুঠো ভরে দিয়ে দেন। টাকার উপর দরদ নেই তাঁর কোন কালেই; হাতে থাকলে পারেন না জমিয়ে রাখতে। এদিকে অসুখ ক্রমেই ওঠে বেড়ে। কোর্টে যাওয়া বন্ধ হয় একদম। কলকাতার সেরা চিকিৎসকরাও কিছুই করতে পারেন না। মধু বুঝতে পারেন—অন্তিম আঁধার আসছে ঘনিয়ে। নির্জলা কড়া মদ খেয়ে যন্ত্রণা ভুলবার চেষ্টা করেন। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে লিখে ফেলেন নিজের সমাধি লিপি। একটু আরাম পাবার আশায় সপরিবারে চলে যান উত্তরপাড়ায় গঙ্গার তীরে এক বন্ধুর গ্রন্থাগারগৃহে। হাঁটা চলার শক্তি তখন আর নেই। এখানে এসে হঠাৎ তাঁর স্ত্রীও পড়লেন অসুস্থ হয়ে; ফিরে এলেন কলকাতায়। বন্ধুবান্ধবরা অনেক চেষ্টায় মধুকে ভর্তি করলেন সেকালের সেরা হাসপাতাল পি. জি. হসপিটালে। বাঙালীদের মধ্যে মধুই প্রথম স্থান পেলেন এখানে। স্ত্রী রইলেন জামাই-এর কাছে।

বৃষ্টি ভেজা এক আষাঢ় সন্ধ্যায় হাসপাতালে মধু শুনলেন তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদ। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—আমারও যাবার সময়

হ'ল। তারপর আবৃত্তি করে চললেন সেক্সপীয়রের কবিতা। দেহে মনে যন্ত্রণা প্রচণ্ড। কিন্তু লেশমাত্র ভয় নেই মুখে, নেই কোন আফশোষ ; জীবনের সঙ্গে যেমন প্রতিমুহূর্তে পাঞ্জা লড়েছেন, তেমনি মৃত্যুর সঙ্গেও পাঞ্জা লড়ে চললেন। কিন্তু হেরে গেলেন শেষ পর্যন্ত। স্ত্রীর মৃত্যুর তিন দিন পর ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জুন তাঁর প্রবল প্রাণের শিখা চিরনির্বাপিত হ'ল। তাঁর কবিতার ভাষায়—সম্মুখ সমরে পড়ি বীরচূড়ামণি বীরবাহু চলি গেলা যমপুরে অকালে।

[দুই]

হাকিমের এজলাসে মধু

মধুসূদন আলিপুরের আদালতে এসেছেন মক্কেলের মামলা লড়তে। এক বাঙালী যুবক সেখানে হাকিম। মামলার শেষে হাকিম মধুসূদনকে সসম্ভ্রমে নিয়ে বসালেন নিজের বিশ্রামের ঘরে। কৌচে গা এলিয়ে মধুসূদন হাকিমের গড়গড়া টানছেন আর জমিয়ে গল্প করছেন জগদীশনাথ রায়ের সঙ্গে। জগদীশবাবু পুলিশের বড় চাকুরে; কিন্তু গান করেন দারুণ ভালো, আর সাহিত্যেরও বড়ো সমঝদার। মধুসূদনের সমবয়সী এবং বন্ধু তিনি। এঁকে কাছে পেলে মধু হয়ে যান আত্মহারা, গল্পে আলোচনায় ওঠেন মেতে। সেদিনও তাই।

কথায় কথায় বাংলা সাহিত্যের আলোচনা এসে গেলো। দুজনে যখন খুব আলোচনা করছেন—যুবক হাকিম তখন সাহিত্য সম্বন্ধে কি একটা মন্তব্য করলেন। মধু বিরক্ত হলেন, বললেন—'তোমরা ছেলেমানুষ; আমাদের কথা শুনে যাও, মন্তব্য করবে না।' কোন ব্যারিস্টার তো দূরের কথা, কোন উপরওয়ালা ম্যাজিস্ট্রেটেরও এই ধরনের ধমকানি সহ্য করেন না এই যুবক হাকিম। এমন দেমাকী আর রাগী তিনি যে লোকে তাঁর সাথে কথা বলতেই ভয় পায়। সবাই ভাবছে—এই বুঝি আগুন জ্বলল। কিন্তু আশ্চর্য, মধুর কথায় হাকিম বিন্দুমাত্র চটলেন না, বরং লজ্জা পেয়ে চুপ করে গেলেন। বোঝা গেল—মধুসূদনের উপর কি দারুণ শ্রদ্ধা আর ভালবাসা তাঁর।

সেদিন তিনি আর কথা বলেন নি ঠিকই, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই মধুসূদনের শূন্য সিংহাসনে জাঁকিয়ে বসেছিলেন তিনিই। এই রাগী

হাকিমের নাম বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বাংলার সাহিত্যসম্রাট তিনি। মধুসূদন বাংলা কবিতাকে যেমন নতুন চেহারা দিয়েছিলেন, বাংলা গদ্যকে তেমনি নতুন করে তুলেছিলেন বঙ্কিম। এখন আমরা তাঁরই জীবনের দিকে দৃষ্টি মেলব।



ভয়তাড়ানো ছেলে

পড়ি-মরি করে ছুটছে সবাই। যে যেদিকে পারছে ছুটছে। গুরু-মশায় পাঠশালা ছুটি দিয়ে ছুটছেন বাড়ীর দিকে। ছাত্ররা ছুটছে যে যার বাড়ীতে যাবার জন্যে। তরকারীওয়ালা ঝাঁকা ফেলে ছুটছে। মুহূর্ত্তের মধ্যে নৈহাটি শহরের পথঘাট বাজার সব জনশূন্য। কি ব্যাপার ?—না—নৈহাটির গঙ্গার ঘাটে গোরার বহর থেমেছে। গোরার বহর মানে ইংরেজ সৈন্য ভর্তি বহু বড়ো বড়ো নৌকোর ঝাঁক। নদীপথে চলতে চলতে ওরা যেখানে ডাঙ্গায় ওঠে সেখানে লুঠপাট মারধোর করে তছনছ করে দিয়ে যায় সব। তাই খবর রটতেই যে যার ঘরে গিয়ে খিল এঁটেছে। কিন্তু পাঁচ ছ' বছরের একটা বাচ্চা ছেলে হাতে একটা

ছড়ি নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল পথের ধারে। বাড়ীর চাকররা এল হাঁ হাঁ করে ; কিন্তু জেদী ছেলে এক পা-ও নড়ল না। বাড়ীর লোক তো ভয়ে একেবারে কাঁটা। এদিকে গোরারা এসে গেল দল বেঁধে। ফুটফুটে ছেলেটাকে একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কি যেন বলাবলি করল নিজেদের মধ্যে ; ছড়িটাকে একটু দেখল। তার পরে চলে গেল— যেদিকে যাচ্ছিল সেই দিকে। ভয়ডরহীন এই ছেলেটার কথা লোকে বলাবলি করতে লাগল পথে ঘাটে।

এই ছেলেটাই কাঁঠালপাড়ার রায়বাহাদুর যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের তৃতীয় পুত্র বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বড়ো হয়ে সে হয়েছিল বাংলার সাহিত্যসম্রাট। শৌর্যবীর্যের দুর্দান্ত সব কাহিনী রচনা করে সে চেয়েছিল বাঙালী জাতির ভয় ভাঙতে, তাদের নতুন করে গড়ে তুলতে।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুন ২৪ পরগনা জেলার কাঁঠালপাড়া গ্রামে জন্ম হয়েছিল তার। কাঁঠালপাড়ার চাটুয্যে বাড়ীর ছিল তখন বোলবোলাও চাল। ফুলবাগান দিয়ে ঘেরা তাদের বিরাট বাড়ী। বাড়ীতে রাধা-গোবিন্দের মন্দির, চণ্ডীমণ্ডপ, দীঘি ; পূজাপার্বণ উৎসব যাত্রা কথকতা লেগেই আছে সম্বৎসর। যাদবচন্দ্র মস্ত সরকারী চাকুরে—ডেপুটি কালেক্টর—থাকেন বাইরে। মা দুর্গাসুন্দরীর তত্ত্বাবধানেই মানুষ হতে থাকে বঙ্কিম। বড্ড রুগ্ন ছেলে, মাঝে মাঝেই ভোগে অসুখে। কিন্তু বুদ্ধি আর মেধা ঝলমল করে তার চাপা ঠোঁট আর চঞ্চল চোখে।

বালক বঙ্কিম

পাঁচ বছর বয়সে হাতেখড়ি হওয়ার পর বঙ্কিমকে পড়াতে শুরু করলেন গৃহশিক্ষক রামপ্রাণ সরকার। তিনি একদিন বলেই ফেললেন বঙ্কিমকে—'যেভাবে তুমি লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে যাচ্ছ তাতে আমার চাকরী আর ক'দিন।' বঙ্কিম তো একদিনে চিনে ফেলেছে অ, আ, ক, খ ইত্যাদি সব কটা বর্ণ। তারপর বানানের পাতার পর

পাতা সে পেরিয়ে যাচ্ছে ছুটে ছুটে। রামপ্রাণ সরকারকে অবিশ্যি এমনিতেই বেশী দিন পড়াতে হয়নি বঙ্কিমকে। কারণ যাদবচন্দ্র কিছু-দিনের মধ্যেই ছেলেদের নিয়ে গেলেন নিজের কাছে মেদিনীপুরে।

মেজদা সঞ্জীবচন্দ্র ভর্তি হয়েছে মেদিনীপুরের সরকারী জেলা স্কুলে। বালক বঙ্কিম মাঝে মাঝেই মেজদার হাত ধরে স্কুলে যায় বেড়াতে। জাঁদরেল প্রধান শিক্ষক টীড্ সাহেব একদিন তাকে দেখে ফেললেন ক্লাসে। জিজ্ঞাসা করলেন—ছেলেটি কে? সঞ্জীব পরিচয় দিল; সঙ্গে সঙ্গে এ কথাটাও বলল যে—ও বর্ণমালা শিখে ফেলেছে একদিন। পরদিন টীড্ সাহেব যাদবচন্দ্রকে অনুরোধ করলেন বঙ্কিমকে তাঁর স্কুলে ভর্তি করে দেওয়ার জন্য। ছ'বছর বয়সেই ইংরেজী বিদ্যালয়ে ভর্তি হল বঙ্কিম। ইংরেজী বিদ্যাতেও সে এগিয়ে যেতে লাগল তর তর করে। ক্লাসে পড়িয়ে যান মাস্টারমশায়; শুনেই মুখস্থ হয়ে যায় বঙ্কিমের। এই বয়সেই মোটা মোটা ইতিহাসের ইংরেজী বই বাড়ীতে বসে পড়ত সে। ইংরেজী বলা কওয়াতে সে এমন পটু হয়েছিল যে রোজ বিকেলে টীড্ সাহেবের বউ, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বউ-এর সঙ্গে বসে বসে দিব্যি গল্পগুজব করত। ওঁরা খুব ভালবাসতেন ফুটফুটে বঙ্কিমকে। বঙ্কিমও শিখে ফেলেছিলো সাহেবী চালচলন। তিন বছর পরে বাবা বদলি হলেন। বঙ্কিম চলে এলো কাঁঠালপাড়ায়।

বাড়ীতে কয়েকমাস পড়ালেন একজন গৃহশিক্ষক; তারপর বঙ্কিম ভর্তি হলো হুগলী কলেজে। সাড়ে এগার বছরের ছেলে; রোজ নৌকায় চড়ে ওপারে যায় পড়তে; ভয় ভীত বলতে কিছু নেই। কালবোশেখীর ঝড়েও মাঝিকে বলে সে নৌকা ছাড়তে, মাঝগঙ্গায় নৌকা যখন আকাশ-পাতালে দোল খায় তখন সে হাসতে হাসতে দেখে সেই প্রলয় নাচ।

তখন যে তার নামই হয়ে গেছে বাঁকা। সে এক দারুণ ব্যাপার। ডাকাতরা খবর পাঠিয়েছে—কাঁঠালপাড়ার চাটুয্যে বাড়ীতে তারা আসবে

ডাকাতি করতে। দিনক্ষণও জানিয়ে দিয়েছে। সেকালের ডাকাতরা এইরকম আগেই খবর দিয়ে আসত ডাকাতি করতে। বাবা নেই বাড়ীতে। জ্যাঠামশায়, কাকামশায়, পিসেমশায়রা তো ভয়েই অস্থির। তাঁরা ঠিক করলেন—বাড়ীর মেয়ে, বৌ আর বাচ্চারা রাতে গিয়ে শোবে পাশের বাড়ীতে। কিন্তু এগার বছরের বঙ্কিম বসল বেঁকে ; কিছুতেই সে যাবে না বাড়ী ছেড়ে। অতটুকু ছেলে বলে কি—ডাকাতের ভয়ে বাড়ী ছেড়ে পালাব নাকি। লেঠেল বসানো হোক বাড়ীতে, মেরে তাড়াতে হবে ডাকাত। জেদী ছেলের গোঁ ! অবশেষে তা-ই করতে হ'ল। ডাকাতরা সত্যি সত্যিই লেঠেলদের তাড়ায় পালিয়ে গেল। ছেলের সাহসে ধন্যি ধন্যি পড়ল; আর সেদিন থেকেই তার নাম হয়ে গেল বাঁকা।

বাঁকা শুধু পড়ে না

বাঁকার হুগলী কলেজ মধুর হিন্দু কলেজের চেয়ে খুব একটা কম যায় না। কলেজের ভেতরে তখন স্কুল কলেজ দুই-ই। বাঁকা ভর্তি হল স্কুল বিভাগে। প্রতি বছর প্রথম হয়ে হয়ে ক্লাসে উঠতে উঠতে চার বছর বাদে এল স্কুলের শেষ পরীক্ষা—বৃত্তি পরীক্ষার পালা। বৃত্তিতেও বাঁকা হল প্রথম, সাতটা বিষয়ের মধ্যে ছ'টাতেই সবার উপরে, মাসে আট টাকা করে বৃত্তি পেল। এর পর শুরু হল কলেজ বিভাগের পড়া ; কলেজের প্রথম বৃত্তি পরীক্ষাতেও প্রথম সে। পরের বছরের বৃত্তি পরীক্ষাতেও তাই—এবার জলপানি দু'বছরের জন্যে মাসে কুড়ি টাকা করে।

কিন্তু তাহলে কি হবে ? ক্লাসের পড়া একদম ভাল লাগে না তার —অসহ্য বোধ হয়। তাই ক্লাস ফাঁকি দিয়ে লাইব্রেরীর আলমারির পাশে বসে পড়ে সে বাইরের বই। বাড়ীতেও মাঝরাত পর্যন্ত সে লাইব্রেরীর বই-ই পড়ে ; হাল্কা বই নয়, মোটা মোটা ইতিহাসের বই, ইংরেজী সাহিত্যের বই। আর ভাটপাড়ার মস্ত বড় পণ্ডিত রাম

শিরোমণির কাছে পড়ে সংস্কৃত কাব্য, নাটক। এদিকে পাঠ্যবইগুলো কিন্তু সব তোলা থাকে তাকের উপর। ঠিক পরীক্ষার আগে আগে ঝাড়া হয় সেগুলোর গায়ের ধুলো। তাতেও প্রথম থেকে শেষ অবধি ক্লাসের প্রথম সে।

কিন্তু বাঁকা শুধু পড়েই না, তাকে ধরেছে আর এক নেশায়। বিকেলে কলেজ থেকে ফিরে সে খেলবে না, আড্ডা দেবে না; সে অর্জুনা দীঘির পাশ দিয়ে একা একাই হাঁটতে থাকবে দক্ষিণমুখো। পথ নেই, তাই কাঁটাকুঁটি ঝোপজঙ্গল ভাঙতে ভাঙতে আসবে লতা গাছ পাতায় আঁধার করা খালের ধারে। গঙ্গার এই সরু খালটা ভাটপাড়া কাঁঠালপাড়ার সীমানা ধরে চলে গেছে জলাভূমিতে। এই গা ছম্ ছম্ আলো আঁধারিতে তার কল্পনার ঘোড়া ছুটে বেড়ায় কত না স্বপ্নরাজ্যে। বর্ষার সরু খাল যখন জলে টইটম্বুর তখন তার কলেজ-ফেরতা নৌকো আর ঘাটে থামে না, সোজা চলে আসে খালের ভিতরে। আচমকা নৌকোর ছলাৎ ছলাৎ শব্দে পাখির ঝাঁক ঝট্‌পট্ করে যায় উড়ে, নৌকোর গায়ে লেগে ফুল লতা পাতা ওঠে নেচে। বাঁকা দুচোখ ভরে দেখে সেই সুন্দরের খেলা।

গঙ্গাও মাতিয়ে তোলে তাকে। কত সন্ধ্যায় গঙ্গার কূলে বসে তন্ময় হয়ে দেখে সে চঞ্চল তরঙ্গের লুটোপুটি, শোনে তার মধুর কলতান। দুর্গাপূজার ভাসানে সে উতরোল গঙ্গার রূপ দেখতে নৌকো ভাসিয়ে যায় ফরাসডাঙ্গায়। কাল-বোশেখীর ভয়াল মেঘে আকাশ যখন ছেয়ে যায়, মাঝ গঙ্গায় যখন ঝড় ওঠে—তখন উথাল পাথাল ঢেউ-এ ডুবু ডুবু নৌকোয় বসে নদীর সেই ভীষণ সৌন্দর্যে মশগুল হয় সে। সৌন্দর্যের এই আনন্দ ক্রমে কবিতা হয়ে ফুটে উঠতে থাকে তার হাতে। বারো তেরো বছর বয়েস থেকেই কবিতা লিখতে শুরু করে বাঁকা।

কবিতার কুরুক্ষেত্রে

মধুসূদন তখনও ইংরেজী লেখাতেই আছেন ডুবে, তাই কবি ঈশ্বর গুপ্তই তখন বাংলা কবিতার একচ্ছত্র সম্রাট। 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'সাধুরঞ্জন' নামে দুটো পত্রিকা তিনি বের করেন ; থো থো করে বিক্রী হয়, গোগ্রাসে পড়ে লোকে। পত্রিকায় তিনি কবিতা লেখেন অনর্গল। শুধু লেখেনই না, স্কুল কলেজের ছাত্রদের দিয়ে লেখানও। চাটুয্যে বাড়ীতে নিয়মিত আসে পত্রিকা দুটো ; আর বাঁকা তা পড়ে তন্ন তন্ন করে। পড়তে পড়তে তার মনেও এল কবিতা লেখার ঝোঁক ; ভাবের হাওয়া তো তার মনের কড়া নাড়ছিলই। একদিন সে লিখে বসল লম্বা এক কবিতা। পাঠিয়ে দিল সেটা প্রভাকরে। অবিশ্যি নিজের নামটা গোপন রেখে লেখকের নাম লিখল ব, চ, চ। কয়েকদিন পরে সত্যি-সত্যিই কবিতাটা ছাপা হল। ব্যস, একবার উৎসাহ বেড়ে উঠল দাউ দাউ করে। মনের কপাট গেল খুলে। কবিতার পর কবিতা লেখা আর ছাপা হতে লাগল প্রভাকরে।

প্রভাকর তো তখন কবিতার কুরুক্ষেত্র। ছাত্রকবিরা কবিতার লড়াই করে পত্রিকার পাতায়। কবিতায় এ ওকে গালি দেয়, তর্ক বাধায়। বাঁকাও যোগ দিল এ লড়াই-এ। লড়াই এমনই জমল যে এক জমিদার বাঁকাকে দু'দুবার পুরস্কার দিলেন দশ টাকা করে। কবিতার হাত বেশ পেকে উঠল বঙ্কিমের। বয়েস যখন পনের তখন সে লিখে ফেলল পুরো একখানা কবিতার বই—'ললিতা ও মানস'।

কিন্তু প্রথম বৃত্তি পরীক্ষা যে এসে গেছে। এদিকে বইপত্র সবই তো তাকে তোলা। সুতরাং কবিতার খাতা এবার বন্ধ হ'ল। কবিতার কুরুক্ষেত্র থেকে পরীক্ষার যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপ দিলো বাঁকা। একের পর এক জয়ের অভিযানে এগিয়ে চলল সে। কবিতার দিকে আর সে মুখ ফিরিয়ে চায় নি কোন দিন।

প্রথম বি. এ

পর পর তিন বছর বৃত্তি পেয়ে বাঁকা যখন চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে সবার তখন বাবা আর বঙ্কিমকে ফেলে রাখতে চাইলেন না হুগলী কলেজে। তাকে কলকাতাতে পড়ানোই সাব্যস্ত হ'ল। ভাড়া বাসায় থাকবার জন্য চাকর মুরলী আর ঠাকুর বাণেশ্বরকে নিয়ে বাঁকা একাই এল কলকাতায়। কলকাতায় তখন সাহেবস্থবো আর বাবুভায়ারা কাঁপছেন সিপাহী বিদ্রোহের ভয়ে। দেশী সিপাহীরা সাহেব তাড়িয়ে স্বাধীনতা আনার লড়াই শুরু করেছে দেশের নানা জায়গায়। নির্ভীক বঙ্কিম তার মধ্যেই পড়া শুরু করল প্রেসিডেন্সী কলেজের আইন বিভাগে।

সেই বছরই প্রথম চালু হল প্রবেশিকা পরীক্ষা। আইন পড়তে পড়তেই বাঁকা দিল প্রবেশিকা পরীক্ষা। পাশ করল প্রথম বিভাগে। এর পরেই জানা গেল—সে বছরই প্রথম বি এ পরীক্ষাও নেওয়া হবে। পরীক্ষার আর তু'মাস মাত্র বাকী। বঙ্কিম ঠিক করল—সে দেবে বি. এ পরীক্ষাও। বি. এ পরীক্ষা দেবার জন্যে তার নাম পাঠাতে সে অনুরোধ করল অধ্যক্ষ সাট্‌ক্লিপ্ সাহেবকে। তিনি তো অবাক। বলে কি ছেলেটা! কঠিন কঠিন এক গাদা বই পড়তে হয় বি. এ-তে। তা পড়ানোর জন্যে রয়েছে আলাদা ক্লাস; দিনের পর দিন অধ্যাপকরা সেখানে পড়াচ্ছেন; তা-ও একজনের বেশী ছাত্রকে সেখান থেকে এবার পাঠান হবে না পরীক্ষা দিতে; আর কিছু না পড়ে আইনের ছাত্র বঙ্কিম বলে কিনা সে দেবে পরীক্ষা! তিনি তো অনেক বোঝালেন; কিন্তু বঙ্কিম নাছোড়বান্দা। ভয়ানক চটে গেলেন সাহেব; কিছুতেই তার নাম পাঠাবেন না ঠিক করলেন। বঙ্কিম অবশেষে আইনের এক জাঁদরেল অধ্যাপক ধরে পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা করে নিল।

আইনের পড়া বন্ধ রেখে দিনরাত বঙ্কিম পড়ে রইল বি. এ-র বই-পত্তর নিয়ে। তু'মাস পরে দিল সে পরীক্ষা। ফল বেরুলে দেখা গেল

পরীক্ষায় পাশ করেছে মাত্র দু'জন। আর এই দু'জনের মধ্যে বঙ্কিমই হয়েছে প্রথম। চারদিকে শোরগোল পড়ে গেল বঙ্কিমের এই দুর্ধর্ষ কীর্তিতে। সগর্বে বঙ্কিম আবার এসে বসল আইনের ক্লাসে। কয়েক দিনের মধ্যে লাট সাহেবের দূত এসে হাজির—সাহেব ডেকেছেন। বঙ্কিম গেল দেখা করতে। লাট সাহেবের সচিব বললেন—সরকার তাকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরী দিতে চান। বঙ্কিমের তেমন ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু বাবার নির্দেশে বিশ বছর বয়সে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরী নিয়ে বঙ্কিম রওনা হল যশোরে।

সংগ্রাম ও সাহিত্য

হাকিম বঙ্কিম কিছুদিন পরে যশোহর থেকে বদলি হয়ে চলে এলেন কাঁথিতে, সেখান থেকে খুলনায়। খুলনায় তখন নীলকর সাহেবদের অত্যাচার রাশ-ছাড়া হয়ে উঠেছে। চাষীরা যাচ্ছে ধনে প্রাণে শেষ হয়ে। ভাল ভাল চাষের জমিতে সাহেবরা নীলের গাছ বুনতে বাধ্য করছে; বুনতে না চাইলে মারপিঠ, খুনজখম, দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধাচ্ছে। এই অত্যাচার বন্ধ করার জন্য হাকিম বঙ্কিম ধারণ করলেন রুদ্ররূপ। গ্রেপ্তার করে এনে জেলে পুরলেন সাহেবের খুনী লাঠিয়ালগুলিকে। ভয়ে সাহেবরা গেল পালিয়ে। বঙ্কিমকে হাত করার জন্য লাখ টাকা ঘুষ দিতে ব্যর্থ হয়ে তারা তাঁকে খুন করারই চক্রান্ত করল। কিন্তু নির্ভীক বঙ্কিম লোভ বা ভয়ের কাছে একটুও মাথা নোয়ালেন না। শুধু নীলকর নয়, খুলনায় নদীতে নদীতে তখন ডাকাত, দস্যুদেরও তাণ্ডব চলছে। বঙ্কিম তাদেরও শায়েস্তা করতে লাগলেন।

বাইরে যখন এই তাণ্ডবের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ক্ষত বিক্ষত হচ্ছেন ঘরে তখন বঙ্কিম বহু বছর পরে আবার সাহিত্য রচনায় নিবিষ্ট হয়েছেন। কবে সেই পনের যোল বছর বয়সে কবিতা লেখা ছেড়েছেন তারপর দশ বছর তো প্রায় কিছুই লেখেন নি। যাও বা লিখেছেন. তাও ইংরাজীতে।

'রাজমোহনের স্ত্রী' নামে একটা বড় ইংরেজী গল্প লিখেছিলেন, কিন্তু তা তেমন যুৎসই হয়নি। তাই আবার তিনি বাংলাতেই ফিরে এলেন। কিন্তু এবার আর পদ্য নয়—গদ্য। পুরোনো কালের বাংলার ইতিহাসের কাহিনীকে নিয়ে নতুন গল্পের জাল বুনতে সুরু করলেন ; সৃষ্টি হতে থাকল 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাস।

খুলনা থেকে বদলি হয়ে বারুইপুরে এসে বঙ্কিম শেষ করলেন 'দুর্গেশনন্দিনী'। ছাপা হল ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে। বাংলা সাহিত্যে এই নতুন জিনিসের দেখা পেয়ে সবাই হৈ হৈ করে উঠল ; সত্যিকারের উপন্যাস বলতে কোন কিছু তো বাংলায় ছিল না এর আগে। পদ্যে যেমন মধুসূদন, গদ্যে তেমনি বঙ্কিম হলেন নতুন স্রষ্টা। গল্পের মানুষ ও ঘটনাগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে গড়ে তুলতে গিয়ে গদ্যভাষাকেও তিনি সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন করে তুললেন। উপন্যাসেই বঙ্কিম তাঁর মনের মত পথ খুঁজে পেলেন। এবার নিশ্চিন্ত হয়ে সেই পথেই তিনি হাঁকালেন তাঁর কল্পনার রাজরথ। এক বছর পরেই বের হল তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা'। প্রথম বইতে যাদের মন ওঠেনি এবার তাদেরও মন ভেসে গেল। ভাষা যেন এবার আপন বেগে গান গেয়ে পাল তুলে ছুটল। বই হয়ে গেল যেন একটা নতুন সুন্দর জগৎ, সেখানে জীবন্ত মানুষের হাসিকান্না সুখদুঃখ পাঠকের মনে আনন্দ বেদনার ঢেউ তুলতে লাগল। উপন্যাসের নরনারীর কথা ফিরতে লাগল লোকের মুখে মুখে। তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে।

বারুইপুর থেকে আলিপুরে বদলি হয়ে বঙ্কিম ছুটি নিয়ে আইন পড়াটা আবার শুরু করলেন। সাহেবদের খবরদারী আর সহ্য হচ্ছে না ; তাই ভাবছেন—চাকরী ছেড়ে ওকালতি করবেন। বহু বছর পরে আইন পরীক্ষা দিয়ে তৃতীয় স্থান দখল করলেন। এই সময়েই তিনি লিখে ফেললেন—তৃতীয় উপন্যাস 'মৃণালিনী'।

খ্যাতির শিখরে

আলিপুর থেকে বদলি হয়ে বহরমপুরে এসে বঙ্কিম ঠিক-দুপুরের সূর্যের মত খ্যাতির মধ্য-গগনে উঠে এলেন। ওখানে তখন আরো অনেক পণ্ডিত সাহিত্যিক বাস করছেন। বঙ্কিম হলেন তাঁদের মধ্যমণি। এঁদের নিয়ে তিনি প্রকাশ করলেন 'বঙ্গদর্শন' নামে এক মাসিক পত্রিকা। জাতির মনকে, তার ভাষা ও সাহিত্যকে মেজে ঘষে সুন্দর ও শক্তিশালী করে তোলার জন্য বঙ্কিম কলম চালাতে লাগলেন সব্যসাচীর মতো। একদিকে উপন্যাসে, প্রবন্ধে, রসরচনায় ভরিয়ে তুলতে থাকলেন বাংলার ভাণ্ডার, অন্যদিকে যা কিছু কুশ্রী, অসুন্দর তাকে কলমের চাবুকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করার চেষ্টায় হলেন রত। তিনি হয়ে উঠলেন বাংলার মানুষের মনের শিক্ষক ;—বাংলার সাহিত্যসম্রাট। লোকে যেমন তাঁকে প্রচণ্ড ভক্তি করত, তেমনি ভয়ও করত দারুণ।

কিন্তু দিনরাত এই অপরিসীম পরিশ্রমের ফলে তাঁর শরীর পড়ল ভেঙে। ছুটি নিয়ে তিনি চলে এলেন বাড়ীতে। সাতদিন ধরে বিদায় উৎসব করল বহরমপুরের মানুষ। এবার বাড়ীতে বসেই পূর্ণবেগে 'বঙ্গদর্শন' চালাতে লাগলেন। একে একে প্রকাশিত হল—বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, কৃষ্ণকান্তের উইল, ইন্দিরা, রাধারাণী, যুগলাঙ্গুরীয় ইত্যাদি উপন্যাস ও গল্প, আর লোকরহস্য, বিজ্ঞানরহস্য, কমলাকান্তের দপ্তর, সাম্য ইত্যাদি রচনামালা।

এতদিন পুরোনো কালের কাহিনী নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন বঙ্কিম। এবার চলতি কালের মানুষকে নিয়ে নতুন নতুন জগৎ সৃষ্টি করলেন তিনি তাঁর বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল ইত্যাদি উপন্যাসে। এত নিটোল, এত জীবন্ত সে সব নরনারী যে তারা আজও বাঙালীর চোখে চোখে ঘুরছে, তাদের মনে আনন্দ বেদনার মোচড় দিচ্ছে।

কিন্তু শরীরও বইছে না, সংসারেও নানা অশান্তি ; তাই চার

বছর চালানোর পর বঙ্কিম একদিন হঠাৎ বন্ধ করে দিলেন 'বঙ্গদর্শন'। বঙ্গদর্শনের এই অপমৃত্যুতে দেশ হাহাকার করে উঠল। অনেকের অনুনয়ে পত্রিকা অবশ্য আবার প্রকাশিত হল। তবে তিনি সম্পাদক করে দিলেন মেজদা সঞ্জীবচন্দ্রকে। নিজে শুধু লিখতে লাগলেন তাতে। প্রকাশিত হল ইতিহাস নিয়ে উপন্যাস—রাজসিংহ, আনন্দমঠ ইত্যাদি।

'আনন্দমঠ' উপন্যাস পরাধীনতার, অত্যাচারের বিরুদ্ধে পুরোনো দিনের বাঙালীর লড়াই-এর কাহিনী ;—কিন্তু বঙ্কিম তার ভেতরে ঢেলে দিলেন নতুন দিনের লড়াই-এর ডাক। এর মধ্যেই দেখা দিল 'বন্দেমাতরম্' গানটি। 'আনন্দমঠ' হয়ে উঠল স্বাধীনতার আগুন ; লড়াই-এ জাগিয়ে তুলল জাতিকে। 'বন্দেমাতরম্' হয়ে গেল দেশকে ভালবাসার মন্ত্র। 'আনন্দমঠ' বেরুতে বঙ্কিমের চাকরি যায় যায় হয়েছিল। এর পর তিনি লিখলেন 'দেবীচৌধুরাণী' আর 'সীতারাম'। সীতারামই বঙ্কিমের শেষ উপন্যাস—উনপঞ্চাশ বছর বয়সে লেখা।

অস্তের পথে

বদলির পর বদলি ;—মালদায়, হুগলীতে, হাওড়ায়, ঝিনাইদহে, উড়িষ্যার জানপুরে, ভদ্রকে। এত ধকল আর সইছে না ; এদিকে ওপর-ওয়ালা সাহেবের তড়পানিও অসহ্য হয়ে উঠেছে। পুলিশের উপর হাড়ে চটা তিনি। পুলিশ মামলা আনলেই আসামীকে দেন খালাস করে। এতে আবার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবরা তাঁর উপরে চটে কাঁই হন। নানাভাবে বঙ্কিমকে অপদস্ত করার চেষ্টা করেন। তাই এবার চাকরি ছাড়ার জন্যে মরিয়া হলেন। অনেক ধরে করে অবশেষে তেপান্ন বছর বয়সে তিনি চাকরির পাট চুকিয়ে দিলেন।

তখনও বঙ্কিমের সেই রাজার মত মূর্তি জ্বলছে বাংলার আকাশে। তার আলো পড়ছে ঠিকরে। বাংলার শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী গুণীরা নিত্য আসেন

সম্রাট দর্শন করতে, নানা বিষয়ে বিচার চাইতে, শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে, আশীর্বাদ নিতে। গোল দীঘির ধারে নিজের বাড়ীতে স্ত্রী, কন্যা, জামাই, নাতিদের নিয়ে আনন্দে কাটছে দিন। লিখছেন এবার ধর্মের কথা—শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র। সরকার তাঁকে সম্মান জানালো—রায়বাহাদুর, সি. আই. ই খেতাব দিয়ে। দেশের বড় বড় পদে বসানো হ'ল তাঁকে।

কিন্তু শরীর তাঁর গেল দ্রুত ভেঙে। দেখা দিল বহুমূত্র রোগ। চাকরি ছাড়ার তিন বছর পরে তিনি একেবারেই শয্যাশায়ী হলেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল শূন্য হ'ল সাহিত্য সম্রাটের সিংহাসন।

[তিন]

নির্ভুল বিচার

বিলেত-ফেরতা ম্যাজিস্ট্রেট রমেশচন্দ্র দত্তের বড় মেয়ের বিয়ে। রমেশ দত্ত আবার বিরাট পণ্ডিত ব্যক্তিও। ইংরেজীতে মহামূল্যবান সব বইপত্তর লিখেছেন। তাঁর মেয়ের বিয়েতে তাই বহু ধনী মানী গুণী ব্যক্তি একে একে আসছেন। এলেন বঙ্কিমচন্দ্রও। তিনি যে একদিক থেকে রমেশ দত্তের গুরু। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পড়ে মোহিত হয়ে রমেশ দত্ত একদিন গিয়েছিলেন তাঁকে সম্মান জানাতে। তখন বঙ্কিমই তাঁকে ইংরেজী ছেড়ে বাংলায় লিখতে বলেছিলেন। তারপরই তাঁর উৎসাহে ভরসা পেয়ে রমেশ দত্ত বাংলায় উপন্যাস লিখতে সুরু করেছেন এবং ঔপন্যাসিক হিসাবেও বিখ্যাত হয়েছেন। তাই বঙ্কিমচন্দ্র বাড়ীর দ্বারে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে রমেশ দত্ত ছুটে এলেন মালা নিয়ে।

সেই মালা যখন বঙ্কিমকে পরাতে যাবেন এমন সময় বিশ বছর বয়সের এক সুপুরুষ যুবক সেখানে এসে হাজির হয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাড়াতাড়ি মালাখানি নিয়ে পরিয়ে দিলেন সেই যুবকের গলায়; বললেন—এ মালা এরই প্রাপ্য।

সাহিত্য সম্রাট সেদিন যে নবীনকে এইভাবে অভিষেক করলেন তিনিই হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর বিশ বছর বয়সের কবিতা পড়েই বঙ্কিম তাঁকে দিয়ে গেলেন নিজের গলার মালা। বিচারক বঙ্কিমের বিচার নির্ভুল।



বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ

স্কুল পালানো ছেলে

দাদা সোমেন্দ্রনাথ আর দিদির ছেলে সত্যপ্রসাদ বয়সে রবির থেকে দু'বছরের বড়। কিন্তু তিনজনেই একসাথে খেলাধুলো করে; চণ্ডী-মণ্ডপের পাঠশালায় যায়, গৃহশিক্ষকের কাছে পড়ে। সোম আর সত্যের বড় স্কুলে পড়ার বয়স হতেই তাদের ভর্তি করা হল কলকাতার ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে। রবি তো কেঁদেই আকুল। সে-ও যাবে ওদের সঙ্গে স্কুলে। অনেক বোঝান সোঝান হল। তবু কিছুতেই সে শুনবে না। অবশেষে গৃহশিক্ষক মাধবমাস্টার পিঠে দু'চার ঘা বসিয়ে দিয়ে বললেন—'আজ স্কুলে যাবার জন্য এত কাঁদছ, ভবিষ্যতে একদিন স্কুলে না যাবার জন্যে এর থেকে অনেক বেশি কাঁদতে হবে তোমাকে।

কি আশ্চর্য! মাধবমাস্টারের কথা একেবারে কাঁটায় কাঁটায় ফলে গেল। রবি তো তখনকার মত কেঁদেকেটে অকালে ভর্তি হ'ল ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে। কিন্তু বদ্ধ ঘরে কিছুদিন আটকা থাকতেই স্কুলে যাবার আনন্দ তার মন থেকে গেল উবে। বাড়ীর কর্তারা ছেলেদের এ স্কুলে বেশী দিন রাখলেন না। তাদের ভর্তি করা হ'ল নর্মাল

স্কুলে। এখানকার ছেলেরা সব ঢ্যাঙা ঢ্যাঙা আর তারা এক একটা নোঙরা শয়তান। এ স্কুল একেবারেই অসহ্য লাগতে লাগল রবির। নানা ছুতোতে স্কুল কামাই শুরু করল সে। ভালভাবে ইংরেজী শেখানোর জন্যে কয়েক বছর পর তাদের এ স্কুলও ছাড়িয়ে ভর্তি করা হ'ল এক ফিরিঙ্গি স্কুল—বেঙ্গল একাডেমীতে। এখানে ছাত্ররা দুরন্ত, কিন্তু বজ্জাত নয়; পড়াশুনো না করলে মাস্টার মশায়রাও কিছুই বলেন না। কিন্তু তাতে কি হবে! স্কুলে মন বসে না যে একেবারেই। নানা অছিলায় স্কুলে না যাওয়ার মাত্রা বেড়েই যায়। হয়রান হয়ে গিয়ে বাড়ীর কর্তারা বেঙ্গল একাডেমী ছাড়িয়ে তাকে ভর্তি করলেন এবার সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলে; বয়স তখন বারো। স্কুল তো খুবই ভালো, ছাত্ররাও ভদ্র, শিক্ষকরাও নিষ্ঠাবান। কিন্তু তাতেই বা কি। স্কুলের নাম শুনলেই গায়ে যে জ্বর আসে রবির। নিজেকে মনে হয় —জেলের কয়েদী বুঝি। স্কুলে সে যেতে চায় না কিছুতেই। বকাঝকা বোঝান সোঝান—সবকিছুই ব্যর্থ হয়। অবশেষে তাকে স্কুল থেকে চিরকালের মত ছাড়িয়ে আনতে হ'ল। মাধবমাস্টারের কথা এই ভাবে যে খেটে যাবে কে-ই বা জানত তা!

কোন কিছু পাশ না করা এই রবিই কিন্তু একদিন প্রচণ্ড সূর্যের মত দিগ্‌দিগন্ত আলোয় ভাসিয়ে হয়ে উঠল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাংলা সাহিতের সংসারে ষাট বছর ধরে সে হয়ে রইল একাই একশ'। কবিতায়, গানে, গল্পে, নাটকে, উপন্যাসে সে বাংলার গরীব ভাঁড়ার দেদার সোনার ফসলে ভরিয়ে উপচিয়ে একেবারে থৈ থৈ করে দিল।

১৮৬১ সালের ৭ই মে সে জন্মগ্রহণ করেছিল কলকাতার জোড়া-সাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে। তার বাবা দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন ধর্মে মর্মে জ্ঞানে গুণে সেকালের কলকাতার একজন শ্রদ্ধেয় মানুষ। জোড়া-

সাঁকোর ঠাকুর পরিবার তো অনেক কাল থেকেই কলকাতার একটা সেরা ধনী ও মানী পরিবার। যেমন প্রকাণ্ড তাঁদের বাড়ী, তেমনি বিরাট তাঁদের সংসার।

বন্দী শৈশব

ভাগ্নে সত্য আব ভাগ্নী ইরু ছিল রবির অন্তরঙ্গ খেলার সাথী। তারা তিনটিতে মিলে ঠাকুরবাড়ীর অজস্র ঘর বারান্দার গোলকধাঁধায় ঘুর ঘুর করত আর মনে নানা স্বপ্ন কল্পনার জাল বুনত। বাড়ীর বাইরে যাওয়া ছিল একেবারেই বারণ, এমন কি অন্তঃপুরে প্রবেশও ছিল নিষেধ। বিরাট পরিবারের দায়িত্ব ছিল মায়ের কাঁধে, তাই তাঁর সঙ্গ পাবারও উপায় ছিল না। চাকরদের তত্ত্বাবধানে বন্দী হয়ে থাকতে হত দিন রাত। চাকর ব্রজেশ্বর তাদের খাওয়াত, গোবিন্দ করাত স্নান আর শ্যাম রাখত আগলিয়ে। বাইরে যাওয়ার উপায় ছিল না বলেই বাইরের টানটা রবির মনে হয়ে উঠেছিল প্রবল। তাই জানলার খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে, ছাদের রেলিঙের ফুটো দিয়ে সে চেয়ে থাকত বাইরের জগতের দিকে। সারিসারি নারকেল গাছের হাওয়ায় দোলানো পাতা, বটের ঝুরি নামানো আলো-আঁধারি ছায়া, দুপুরের রাজহাঁস চরা নির্জন পুকুর, রোদ ঝলসানো কলকাতার উঁচুনীচু চিলেকোঠা আর নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে ফেরিওয়ালার ডাককে ঘিরে কল্পনার পর কল্পনার প্রাসাদ গড়ত সে আপন মনে।

পড়াশুনোর জেলখানাতেও সে ছিল কয়েদী। বারো বছর বয়স পর্যন্ত স্কুলে তো তাকে যেতেই হত। তাছাড়া বাড়ীতে ছিল শিক্ষার একেবারে ফলাও আয়োজন। দাদা হেমেন্দ্রনাথ ছিলেন এই শিক্ষা কারখানার কড়া ম্যানেজার। সূর্য ওঠার আগেই উঠতে হত বিছানা ছেড়ে। সেই ভোরে লেংটি পরে কুস্তি লড়তে হত কানা পালোয়ানের সাথে; এরপরই শুরু হত পড়া। একের পর এক মাস্টার আসতেন বাড়ীতে। স্কুলের পড়ার

থেকে অনেক অনেক বেশী পড়াতেন তাঁরা। মেঘনাদবধ, সীতার বনবাস থেকে পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, ইতিহাস, ভূগোল, পদার্থবিদ্যা কোন কিছুই বাদ পড়েনি।

শুধু কি তাই—। হেরম্ব তত্ত্বরত্ন আসতেন দাঁতভাঙা সংস্কৃত ব্যাকরণ শেখাতে। মাঝে মাঝে নরকঙ্কাল নিয়ে এসে একজন পড়িয়ে যেতেন শারীরবিদ্যা। আর সতীনাথ দত্ত একেবারে যন্ত্রপাতি দিয়েই হাতে কলমে শেখাতেন বিজ্ঞান। স্কুল থেকে ফিরলেই হাজির হতেন জিমনাস্টিকের শিক্ষক। দেহের কসরৎ শেষ হতে না হতে এসে পড়তেন অঙ্কন শিক্ষক। সন্ধ্যেবেলায় রেড়ীর তেলের বাতি জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে অঘোর মাস্টার আসতেন ইংরেজী পড়াতে। ঘুমে ঢুলে পড়লেও রেহাই ছিল না রাত ন'টা পর্যন্ত। অবশ্য অঘোরবাবু চলে যাওয়ার সাথে সাথে ঘুমের ঘোরও কোথায় পালাত ছুটে।

ছন্দসুরের দোলায়

কিন্তু জোর জবরদস্তির পড়া খুব বেশী দূর পৌঁছত না রবির মনের অন্তঃপুরে। পড়ানোর সাথে আনন্দের যেখানে মিলন ঘটত সেখানেই হত তার সত্যিকারের শেখা। খুব ছোটবেলায় চাকর মহলে সন্ধ্যার আবছা আলোয় ব্রজেশ্বর শোনাত রামায়ণের গল্প। আর তাই মাঝে খাজাঞ্চি কিশোরী চাটুয্যে হঠাৎ এসে ছড়াকাটা ঝরনা সুরে দাশুরায়ের পাঁচালী গেয়ে ছন্দের দোলায় শিশুরবির মনকে দিতেন দুলিয়ে। শ্যাম যখন মিটমিটে আলোয় রঘু ডাকাতের গল্প বলত তখনও তার ছোঁয়া লাগত বালকের মনে। 'জল পড়ে পাতা নড়ে'র ধ্বনির মিল তার প্রাণকে দিত আনন্দে উতরোল করে। 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টাপুর নদেয় এল বান' পড়তে পড়তে তার মনে লাগত স্বপ্নের ঘোর। বাংলা বই পেলেই সে পড়ে ফেলত; দাদাদের আলমারী থেকে চুরি করেও পড়ত। অল্প স্বল্প সে বুঝত আর বাকিটা ভরিয়ে নিত কল্পনা দিয়ে।

কবিতা গান অভিনয়ের ঢেউ সদাই বইত এ বাড়ীর অন্দরে বাইরে। বড়দা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন কবিতার ভাবে ভোলা মানুষ। কবিতা লেখা আর গলা ছেড়ে আবৃত্তি করায় তিনি থাকতেন মশগুল। সেজদা হেমেন্দ্রনাথ গাইতেন গান, আর জ্যোতিদাদা তো ছিলেন গান নাটক পাগল লোক। খুড়তুতো দাদা গণেন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথ ছিলেন আসর মাতানো মানুষ; অভিনয়ের মহড়া, গানের জলসা লেগেই ছিল তাঁদের বৈঠকখানায়। এই আবহাওয়ার ভেতরে বড় হতে হতে বালক রবির রক্তে মিশে গিয়েছিল কবিতা, গান, অভিনয়। ভারী মিষ্টি গলা ছিল তার; লেগে পড়ে সে শেখেনি; কিন্তু বাড়ীতে গানের যে স্রোত বইত তার থেকে অনেক কিছুই তুলে নিয়েছিল নিজের কণ্ঠে।

বয়স যখন সাত আট তখন ছ'বছরের বড়ো খুড়তুতো ভাগ্‌নে জ্যোতিপ্রকাশ একদিন তাকে আদেশ করে বসলেন কবিতা লিখতে; ছন্দ ও মিলের কায়দাকানুনও দিলেন শিখিয়ে! বালক রবি লিখতে বসল কবিতা; প্রথম পদ্যটা মিলিয়ে নেশা ধরে গেল কবিতা লেখার। নীল কাগজের খাতা উঠতে লাগল ভরে। স্কুলে, বাড়ীতে সবাই দিতে লাগল বাহবা। লেখা চলল তরতরিয়ে। এমনি সময় বয়েস যখন এগার, বাবাই দিলেন তার ঘরের গণ্ডী ঘুচিয়ে; রবিকে নিয়ে তিনি চললেন বোলপুর হয়ে ডালহৌসী পাহাড়ে। খাঁচার পাখি মুক্তি পেয়ে আনন্দে হ'ল আত্মহারা! বাইরের জগৎ রঙে রসে মাখা হয়ে দেখা দিল তার চোখে। বোলপুরের খোলা মাঠে শিশু নারকেল গাছের গায়ে হেলান দিয়ে কাঁকরের মাটিতে পা ছড়িয়ে বালক রবি লিখে ফেলল 'পৃথ্বীরাজ পরাজয়' কাব্য।

পাহাড় থেকে ফিরে মুক্তির ছোঁয়া লাগা মনটা তার আর কিছুই ক্লাসের খোপে ঢুকতে চাইল না; মাও গেলেন মারা। মাতৃহারা ছেলেকে বেশী জোর জবরদস্তি করাও সম্ভব হ'ল না। নতুন স্কুলে পাঠানোও

ক্রমে অসম্ভব হয়ে পড়ল। গৃহশিক্ষক জ্ঞানবাবু তখন তাকে ইংরেজী কবিতাকে বাংলা কবিতায় তর্জমা করা শেখাতে লাগলেন। মহাকবি সেক্সপীয়রের 'ম্যাকবেথ' বইকে অতটুকু ছেলে বেশ সুন্দর তর্জমা করছিল।

কিন্তু সে শেখাও বেশি দূর এগুলো না। জ্ঞানবাবু চলে গেলেন অন্যকাজে ; এলেন ব্রজবাবু। তিনি পারলেন না রবিকে এঁটে উঠতে। তাই গৃহশিক্ষকের পড়ানও এবার বন্ধ হ'ল। নিজের ইচ্ছার পড়া কিন্তু চলতে লাগল জোর কদমে। বাংলার যাবতীয় বই, পত্রপত্রিকা, এমনকি পুরোনো বাংলা কবিতা পর্যন্ত রবি পড়ে ফেলতে লাগল। কিন্তু বাড়ীর সবার দারুণ আফশোষ—এমন ছেলেটা গেল নষ্ট হয়ে।

কবিতার জমিতে

কিছুই হল না, মান মর্যাদাও রইল না ভেবে রবিরও মন যন্ত্রণায় করতে লাগল ছটফট। কবিতাকে আঁকড়ে ধরে মাথা তোলবার চেষ্টায় সে হল মরিয়া। তাদের বাড়িতে আসতেন কবিতার সমঝদার অক্ষয় চৌধুরী, আসতেন সেকালের সেরা কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী। আর নতুন বৌদি ছিলেন কবিতার ভক্ত। রবি নিল এঁদের সঙ্গে। 'জ্ঞানাঙ্কুর' বলে একটা ছোট্ট পত্রিকায় সে লিখতে লাগল কবিতা, প্রবন্ধ ; তখন তার বয়স তের চোদ্দ।

স্বদেশী মেলায় দেশের গুণগান করে কবিতাও পড়তে পেল সে। দাদারা তার তো দেশের কাজে মত্ত। জ্যোতিদাদা গড়লেন একটা গোপন সমিতি। দেশকে ভালবাসার শিক্ষা দেওয়া হত সেখানে। বড়োদের সাথে রবিও মেতে রইল এই সমিতিতে। কবিতার সাথে দেশকে ভালবাসার মিলন হ'ল তার মনে।

বয়স যখন ষোল বড়দা আর জ্যোতিদা তখন বের করলেন 'ভারতী' নামে একটা মাসিক পত্রিকা। রবিকেও তাঁরা নিলেন টেনে। রবিও অজস্র লেখায় ভরে দিতে থাকল পত্রিকা। বছরখানেক

যেতে না যেতে বিলেত-ফেরত জজসাহেব মেজদা ঠিক করলেন রবিকে বিলেত নিয়ে যাবেন ব্যারিস্টারী পড়াতে।

সত্যেন্দ্রনাথের সাথে রবি গেলেন বিলেতে। প্রথমে ভর্তি হলেন ব্রাইটনের এক স্কুলে, পরে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে সুরু করলেন পড়া। খোলামেলা জীবনও লাগল বেশ ভাল। 'ভারতী' পত্রিকায় ওদেশের বিলিতি গানও শিখে ফেললেন মন দিয়ে। ওদেশের মানুষের কথা লিখে পাঠাতে লাগলেন কিস্তির পর কিস্তি। তা পড়ে বাবার কিন্তু মনে হ'ল—ছেলে যাচ্ছে বিগড়ে। তাঁর আদেশে লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে দেড়বছরের মাথায় ফিরতে হ'ল দেশে।

হতাশায় রবির মনটা রইল দুমড়ে। জ্যোতিদা, নতুন বৌঠান দিলেন তাকে স্নেহের আশ্রয়। জ্যোতিদা পিয়ানো বাজিয়ে তোলেন নতুন নতুন সুর আর রবি সেই সুরে বাঁধে গান। রবি লিখল দেশী বিদেশী সুরের গানে ভরা নাটক 'বাল্মীকিপ্রতিভা'। অভিনয় হ'ল বাড়িতে। সে সাজল বাল্মীকি। স্বাস্থ্য সৌন্দর্য উপছিয়ে পড়ছে তার দেহে, কণ্ঠও সুমধুর; অভিনয়ে সবাই মুগ্ধ। কিন্তু মনে তবু ঘোর অসন্তোষ—ভবিষ্যৎ-এর কোন আলো নেই যে চোখের সামনে। বাড়ীর কর্তারা শেষ পর্যন্ত ঠিক করলেন—আবার বিলেতে গিয়ে লেখাপড়াটা শেষ করে ফিরবে সে। ভাগনে সত্যপ্রসাদের সাথে সে রওনাও হ'ল; কিন্তু কি যে হল, মাদ্রাজের জাহাজঘাটা থেকে দুজনেই এল ফিরে।

মনের মেঘ জমল আরো ঘন হয়ে। জোড়াসাঁকো ছেড়ে রবি গিয়ে উঠল চন্দননগরের গঙ্গাতীরে জ্যোতিদাদার বাসায়। আপন মনে লিখে চলল 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র কবিতা আর গান। মনের যন্ত্রণার ছায়া তাতে। কিন্তু ভেবে ভেবে বানানো নয় এ কবিতা, পদ্ম যেমন আপনা থেকে পাপড়ি মেলে তেমনি মন থেকে ফুটে উঠেছে তা। রবি যেন উদয় হচ্ছে পূব আকাশে; এ যেন তারই আভা।

জ্যোতিদাদা বাসা বদল করলেন কলকাতার সদর ষ্ট্রীটে ; রাবও রইল সাথে। সেখানে একদিন সকালের রোদ ঝল্‌মল্‌ গাছপালা মানুষজন বাড়িঘরের দিকে চেয়ে চেয়ে তার মন ভরে গেল খুশীতে, ভালবাসায়। মনে হল—কি সুন্দর এই জগৎ, এই জীবন। কলম থেকে বেরিয়ে পড়ল 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতা—'আজি এ প্রভাতে কি জানি কেনরে জাগিয়া উঠেছে প্রাণ'। মনের সব আঁধার গেল সেদিন টুটে। স্থির হয়ে গেল রবির জীবনের লক্ষ্য—কবিতায় জমিতেই ফুলে পল্লবে সে উঠবে ঝাড়িয়ে। বয়স তখন তার বিশ বছর।

মধ্যাহ্নের রবি

কবিতা আর কবিতা! পয়ের ষাট বছর ধরে রবীন্দ্রনাথ অঝোরে লিখলেন কবিতা—কত শত ভাব নিয়ে কবিতা, গল্প নিয়ে কবিতা, কবিতায় গল্প, কবিতায় নাটক। কখনও মিলের কবিতা, কখনও গদ্যের ধাঁচে কবিতা। কখনও হাসির কবিতা কখনও শিশুর কবিতা। শুধু কবিতা নয়, নানা সুরে ঢালা গান, নানা ভাবে ভরা গল্প, নাটক, উপন্যাসও তিনি লিখলেন অজস্র। বয়স যখন পঞ্চাশ তখনই তিনি বাংলা ভাষার দরিদ্র ভাণ্ডার ভরে দিয়েছেন সোনার ফসলে। লেখা হয়ে গেছে মানসী, সোনারতরী, চিত্রা, কথা কাহিনী, কল্পনা, খেয়া, শিশু, গীতাঞ্জলি ইত্যাদি কাব্য ; বৌঠাকুরাণীর হাট, চোখের বালি, নৌকাডুবি, গোরা ইত্যাদি উপন্যাস ; গল্পগুচ্ছ বই-এর অধিকাংশ গল্প ; রাজা ও রাণী, বিসর্জন, ডাকঘর, অচলায়তন ইত্যাদি নাটক আর অগণ্য প্রবন্ধ।

শুধু সাহিত্য নয়, শিক্ষার কাজেও তিনি হাত লাগিয়েছেন ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ বছর বয়স থেকেই। দেওয়ালে আটকানো নিরানন্দ স্কুলে পড়তে যাওয়ার দুঃখ কাঁটার মত বিঁধে আছে তাঁর মনে। তাই ছেলে-মেয়ে বড় হতেই কবি তাদের নিয়ে এলেন নিজের কাছে। তিনি তখন নিজেদের জমিদারীর ব্যবস্থাপক ; থাকেন কখনও পদ্মার উপরে বোটে,

কখনও শিলাইদহের কাছারী বাড়ীতে। কাছারী বাড়ীতেই করলেন শিক্ষার আয়োজন। বছর কয়েক পরে সে আয়োজনকে সরিয়ে আনলেন শান্তিনিকেতনের খোলা মাঠে। এখানে ছিল পিতার নির্জন উপাসনার মন্দির আর অথিতিশালা। তার মধ্যেই ছ'টি ছেলেকে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন ব্রহ্মচর্যাশ্রম। নীল আকাশের নীচে গাছপালা আলো হাওয়ার সাথে মিলে মিশে লেখাপড়ার ব্যবস্থা হল। ক্রমে মনের মত করে সাজিয়ে তুললেন এই শিক্ষার আশ্রমকে। শান্তিনিকেতন হয়ে উঠল ভারতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাভূমি।

কেবল বিষয়কাজ, সাহিত্য আর শিক্ষা নিয়ে তন্ময় থাকতে পারেন না তিনি! বাল্য থেকেই স্বদেশপ্রেম তাঁর রক্তে রক্তে। তাই দেশের বুকে যখনই নেমে আসে উৎপীড়ন অত্যাচার, তখনই তিনি ছুটে আসেন সাহিত্যের কুঞ্জ ছেড়ে। দাঁড়ান সভায় সম্মেলনে ; প্রবন্ধ পড়েন, লেখেন। ১৯০৫ সালে বাংলাদেশকে যখন দুভাগ করার চক্রান্ত করল বৃটিশরাজ কবি তখন কলম হাতে রুখে দাঁড়ালেন। বাঙালীর একতাকে অটুট রাখার ডাক দিয়ে লিখলেন গান, গেয়ে বেড়ালেন পথে পথে, পরিচালনা করলেন রাখীবন্ধন উৎসব। পল্লীগ্রামের মানুষের উন্নতির জন্য নানা কাজেও হাত দিলেন।

১৯১২ সালে কবি যখন পঞ্চাশ বছরে পড়লেন বাঙালী তখন তাঁকে শ্রেষ্ঠ কবির আসনে বসাল সাড়ম্বরে। ঐ বছরের পঁচিশে বৈশাখ থেকে পালিত হতে থাকল কবির জন্মোৎসব। কবির সাহিত্যজীবনের অর্ধেক তখনও বাকি।

বিশ্বের কবি

নদীর স্রোতের মত নিয়ত সামনে ধেয়ে চলাই রবি কবির স্বভাব। জগতের সব রঙ রূপে, গন্ধে গানে ভরে তুলতে চান তিনি আপন মনের সাজি। তাই ভারতের নানা স্থানে মাসের পর মাস বাস করেন। এবার

একান্ন বছর বয়সে কবি সুরু করলেন ভারতের বাইরে বিশ্বের দেশে দেশে তীর্থভ্রমণ। চললেন ইংলণ্ডে। সঙ্গে নিলেন ইংরেজীতে নিজেরই তর্জমা করা গীতাঞ্জলির একশ'টি গানের একখানা খাতা।

ক'জনই বা চেনে তাঁকে তখন ওদেশে। একজন পরিচিত গুণী-জনের সাথে দেখা হতে কবি তাঁকে উপহার দিলেন গীতাঞ্জলির খাতাখানি। খাতাখানি পড়ে তিনি ছুটলেন কবিশ্রেষ্ঠ ইয়েট্‌সের কাছে। গ্রামের বাড়ী থেকে ইয়েট্‌স্ ছুটে এলেন লণ্ডনে কবিকে দেখতে। তিনি তো সে যুগের পৃথিবীর কোন কবির লেখায় এত গভীর ভাব খুঁজে পান নি! বিলেতের জ্ঞানীগুণীরা মিলে কবিকে দিলেন বিপুল সংবর্ধনা। ব্যবস্থা হল 'গীতাঞ্জলি' ছাপানোর। কবি চলে গেলেন আমেরিকায়। ছ'মাস আমেরিকায় কাটিয়ে কবি যখন আবার বিলেতে ফিরলেন তখন গীতাঞ্জলি প্রকাশিত হয়েছে। পত্র-পত্রিকা রবি ঠাকুরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাঁর 'রাজা' ও 'ডাকঘর' নাটক দুটোও ইংরেজীতে ছাপা হচ্ছে। ষোল মাস বিদেশে কাটিয়ে কবি ফিরলেন স্বদেশে।

দেশে তখন তাঁকে চারিদিক থেকে সংবর্ধনা দেবার আয়োজন চলছে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উপাধি দেওয়ার ব্যবস্থা করছে, এমন সময় ১৯১৩ সালের ১৫ই নভেম্বর খবর এল—সাহিত্যের জন্যে তাঁকে বিশ্বের সেরা সম্মান নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। দলে দলে লোক ছুটে এলো শান্তিনিকেতনে; সেখানে বিপুল সংবর্ধনা হল কবির। বাংলার কবি হলেন বিশ্বকবি। দু'বছর বাদে বৃটিশ সরকার কবিকে দিলেন 'স্যার' উপাধি।

প্রৌঢ় কবির মন এখন দেশের গণ্ডী কাটিয়ে সারা পৃথিবীটাকে তুলে নিতে চাইছে আপন অন্তরে। ছাপান্ন বছর বয়সে কবি দশমাস ধরে পরিক্রমা করলেন জাপানে আমেরিকায়। কবির উদ্দেশ্যে সম্মানের

শ্রদ্ধায় বান ডেকেছে তখন দেশে দেশে। দু'মাস ধরে প্রত্যহ তাঁকে বক্তৃতা দিতে হ'ল। পয়সা দিয়ে টিকিট কেটে লোকে তাঁর বক্তৃতা শুনতে এল প্রতিদিন।

ষাট বছর বয়স থেকে কবির চলার বেগ যেন আরও বেড়ে গেল, বিশ্বকে আলিঙ্গন করার আকাঙ্ক্ষা হ'ল প্রবলতর। ষাট থেকে সত্তর বছর বয়সের মধ্যে কবি সাড়ে চার বছরই কাটালেন বিদেশ ভ্রমণে। ফ্রান্স, ইতালি, সুইজারল্যাণ্ড, নরওয়ে, সুইডেন হাঙ্গেরী, চোকাস্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া ইত্যাদি ইউরোপের কোন দেশ বাকী রইল না। গেলেন চীনে, মিশরে, গ্রীসে, ইরানে, ইরাকে, জাভা বালি মালয় যবদ্বীপে, থাইল্যাণ্ডে, ইন্দোচীনে। কানাডা, দক্ষিণ আমেরিকাতেও তিনি ঘুরলেন ; আর—অনেক বাধা পেরিয়ে উনসত্তর বছর বয়সে কবি দেখে এলেন সভ্যতার তীর্থভূমি সোভিয়েত ইউনিয়নকে।

সারা পৃথিবীটাকে কবি যখন পেলেন আপন করে তখন তিনি শান্তিনিকেতনের আশ্রমকে পরিণত করলেন বিশ্ববিদ্যার আশ্রমে। জন্ম হল বিশ্বভারতীর। নানা দেশের জ্ঞান বিদ্যার যা কিছু মূল্যবান তাকেই এনে রোপন করলেন এই প্রান্তরে। নানা দেশ থেকে পণ্ডিতেরা এলেন জ্ঞানের আলো বিতরণ করতে। নিজের বই-এর আয় কবি দিয়ে দিলেন বিশ্বভারতীকে। দেশ বিদেশ ঘুরে লক্ষ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে আনলেন ; ছাত্র ছাত্রীদের নাচ গান অভিনয়ের দল নিয়ে পঁচাত্তর বছর বয়সেও নানাস্থানে ঘুরলেন বিশ্বভারতীর অর্থাভাব পূরণ করতে।

বিশ্বের কবি

বিশ্বকবি কিন্তু একমুহূর্তের জন্যেও ভুললেন না তাঁর পীড়িত পদানত দেশকে। দরিদ্র গ্রামবাসীর উন্নতির নানা চেষ্টায় তিনি লেগে রইলেন সারা জীবন। শান্তিনিকেতনের কাছেই গড়লেন

শ্রীনিকেতন। গ্রামের মানুষের কৃষি শিক্ষা স্বাস্থ্যের উন্নতির বিভিন্ন কাজে দিলেন হাত। বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষ—নিজে 'ফাল্গুনী' নাটক অভিনয় করে টাকা তুলে পাঠালেন; শিলাইদহে কলেরা—ডাক্তার, ওষুধ পাঠিয়ে দিলেন।

দেশ ও দেশবাসীর উপর কোন অবিচার অত্যাচারেই তিনি মুখ বুঁজে রইলেন না কোনদিন। পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে যখন ইংরেজ শাসকরা নিরীহ দেশবাসীকে শয়ে শয়ে খুন করল তখন নির্মম শাসকের মুখের উপর তাদের দেওয়া 'স্যার' উপাধিটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিতে তাঁর হাত কাঁপেনি একটুও। আবার মেদিনীপুরের হিজলী জেলে বন্দী স্বাধীনতা-কর্মীদের উপর যখন গুলি চলল তখন সত্তর বছর বয়সে কবি এসে দাঁড়ালেন কলকাতার মনুমেণ্টের নীচে। লক্ষ লোকের সভায় ক্ষুব্ধ প্রতিবাদ জানালেন। আর, শেষ জন্মদিনেও রোগশয্যা থেকে ধিক্কার দিলেন মানুষের প্রতি মানুষের, এক দেশের উপর অন্যদেশের নির্যাতনকে।

দেশে বিদেশে চলায় বসায় কবির কলম কিন্তু থামেনি কখনও। চিন্তাভাবনাতেও মরচে পড়েনি কোনদিন। নতুনের সাথে পা মিলিয়ে কবি বারে বারে হয়েছেন নতুন। তাই তাঁর সাহিত্যও থেকেছে চির নবীন। ঋতুতে ঋতুতে ফলেছে নতুন ফসল। বৃদ্ধ বয়সে কবি হঠাৎ হাতে তুলে নিলেন রং তুলি, আঁকলেন ভাবে কল্পনায় স্বপ্নে ভরা বহু ছবি। ফারসী দেশে, রাশিয়ায় সে সব ছবির প্রদর্শনী হ'ল, সবাই ভূয়সী প্রশংসা করল শিল্পী কবির।

পঞ্চাশ থেকে আশি বছরের মধ্যে কবি লিখেছেন বলাকা, পূরবী, পুনশ্চ, বীথিকা, পত্রপুট, শ্যামলী, নবজাতক ইত্যাদি বহু কবিতার বই, ছোটদের জন্য লিখেছেন শিশু ভোলানাথ, ছড়ার ছবি, ছড়া ইত্যাদি; লিখেছেন ঘরে বাইরে, যোগাযোগ, শেষের কবিতা, চার অধ্যায় ইত্যাদি

উপন্যাস, মুক্তধারা, রক্তকরবী, তাসের দেশ ইত্যাদি অনেকগুলি নাটক, আর লিখেছেন বহু গল্প, অজস্র প্রবন্ধ, স্কুলের পাঠ্য পুস্তক, এমন কি বিজ্ঞানের বই পর্যন্ত। তাছাড়া প্রতিটি ভ্রমণ উপলক্ষে এক একখানা ভ্রমণ কাহিনী আর শত শত চিঠিপত্রও লিখেছেন।

যতক্ষণ চেতনা ছিল তাঁর, ততক্ষণই লিখেছেন। ১৯৪১ সালের ৩০শে জুলাই সকাল সাড়ে ন'টায় লেখা হ'ল তাঁর শেষ কবিতা—'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি'।

তারপরই তাঁর দেহে হল অস্ত্রোপচার। কিন্তু জ্ঞান আর ফিরে এল না। ১৯৪১ সালের ৭ই আগস্ট তিনি চিরবিদায় নিলেন। ৮০ বছরের বিশাল জীবন বিচিত্র ফলে ফুলে জগতকে পরিতৃপ্ত করে নিথর হ'ল।

[চার]

ঈর্ষাভাজন লেখক

পঁচাত্তর বছরের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ আশীর্বাদ করতে এসেছেন এক কনিষ্ঠ সাহিত্যিককে। কনিষ্ঠের জন্মের ষাট বছর পূর্ণ হ'ল। তাই দেশের কবি সাহিত্যিকরা মিলেছেন তাঁকে সংবর্ধনা জানাতে। বিশ্বকবিই আজকের সংবর্ধনা সভার পুরোহিত। আশীর্বাদ করতে উঠে কবিগুরু বললেন—'অন্য লেখকেরা অনেক প্রশংসা পেয়েছেন, কিন্তু সব ধরনের মানুষের এত ভালবাসা তোমার মত আর কেউ পান নি। বাংলা দেশের ঘরে ঘরে তোমার অভিনন্দন আপনা আপনিই উপচে পড়ছে। অনায়াসে যে প্রচুর সফলতা তুমি পেয়েছ তাতে তুমি আমাদের ঈর্ষাভাজন।'

কে এই মহাভাগ্যবান সাহিত্যিক ? বিশ্ববিজয়ী কবি পর্যন্ত যাঁর মত ভালবাসা পান নি বাংলার সব ধরনের মানুষের কাছ থেকে ?—যাঁর সফলতা কবিগুরুরও মনে ঈর্ষা জাগায় ? বাংলার এই প্রিয়তম লেখক হচ্ছেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সাঁইত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি ছিলেন সকলের অগোচরে। তারপর তিনি দেখা দিলেন একেবারে শরতের নিষ্কলঙ্ক আকাশের চাঁদ হয়ে। প্রথম থেকেই ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় মন কেড়ে নিলেন সবার। ভালমন্দের বাছবিচার করল না কেউ, পরীক্ষা দিতে হল না কোথাও, প্রথম দেখাতেই সবাই মাথায় তুলে নিল তাঁকে।

তাঁর 'পথের দাবী' বইখানা ইংরেজ সরকার বেআইনী করে দিয়েছিল। সেই তিন টাকার বই সে-কালে একশ' টাকাতে পর্যন্ত বিক্রী হয়েছে। পাঁচশ' পৃষ্ঠার পুরো বইখানা হাতে নকল করে নিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে পড়েছে দেশপ্রেমিকরা।



প্রিয়তম লেখক শরৎচন্দ্র

দস্যিছেলে

কলকেতে তামাকটিকে সাজিয়ে রেখে, ছেলেদের পড়তে বলে পণ্ডিতমশায় গিয়েছিলেন একটু বাইরে। ফিরে এসে টিকে ধরিয়ে হুঁকোয় দিলেন টান। যত টানেন, ধোঁয়া আর বেরোয়না। বিরক্ত হয়ে কলকে উপুড় করে ফেললেন মাটিতে। একি! তামাক নেই, তার জায়গায় কয়েকটা ইঁটের টুকরো! কড়া মেজাজের পণ্ডিতমশায় উঠলেন গর্জে—এ কার কাজ? বল্ শিগ্‌গীর।' একটা ছেলে ভয়ে বলে ফেলল—'গুরুমশায়, ন্যাড়া।' আর যাবে কোথায়! পণ্ডিতমশায় বেত হাতে উঠলেন লাফিয়ে। ন্যাড়াও অমনি তড়াক্ করে দাঁড়িয়ে এক ধাক্কায় ছেলেটাকে ধরাশায়ী করে দিল ছুট্। ছুটতে ছুটতে একেবারে সরস্বতী নদীর তীরে; তারপর জেলেদের ডিঙি খুলে নিয়ে বাইতে বাইতে তিন মাইল দূরে বৈরাগীর আখড়ায়। ছেলে আর ফেরে না বাড়ীতে। তাই বাবাকেও ছুটতে হল; বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাড়ীতে নিয়ে এলেন।

একদিন পাড়ার মুখুয্যে গিন্নী এলেন হাঁ হাঁ করে—'কাল রাতে

ন্যাড়া তার দলবল নিয়ে আমার ক্ষেতের কচি কচি শশাগুলো একেবারে মুড়িয়ে নিয়ে গেছে।' নিত্য এইরকম অভিযোগে বাবা মা অতিষ্ঠ।

এই দস্যি ছেলে ন্যাড়াই একদিন হয়ে উঠেছিল বাংলার প্রিয়তম সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৮৭৬ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর সে জন্মেছিল হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামের এক অভাব অনটনের সংসারে। বাবা মতিলাল ছিলেন কেমন এক খাপছাড়া ধরনের মানুষ। লেখাপড়া শিখেও কোন দিন টাকা পয়সা রোজগারের দিকে মন দেন নি। আপন মনে শুধু বই পড়তেন; কবিতা, উপন্যাস, গল্প, নাটক লিখে যেতেন আর ছবি আঁকতেন; কিন্তু কোন লেখাই তিনি শেষ করতেন না।

ঘরের কষ্টদুঃখ দুষ্টুছেলে ন্যাড়াকে ছেলেবেলাতেই করে তুলেছিল বারমুখী। চেহারা, বুদ্ধিতে ঝলমল চোখ আর হরিণের মত সরু সরু পা নিয়ে ন্যাড়া ঘুরে বেড়াত বাগানে, নদীর পাড়ে, আর পথে পথে। তার দস্যিপনাতে অস্থির বাড়ীর লোক, পাড়ার লোক। দস্যিছেলে ন্যাড়াকে শান্ত করতে পারেন একমাত্র ঠাকুরমা। আদরের নাতিকে কোলের কাছে নিয়ে তিনি যখন রামায়ণ মহাভারতের গল্প পড়েন ন্যাড়া তখন কোথায় যেন যায় তলিয়ে। দুষ্টুমির মতো পড়াশুনোতেও সে ওস্তাদ। পাঁচ বছর বয়সে তাকে ভর্তি করা হল গ্রামের প্যারী পণ্ডিতের পাঠশালায়। পাঠশালার পর সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্যির বাংলা স্কুলে বোধোদয়, পদ্যপাঠ সে শেষ করে ফেলেছে।

অভাবে-অনটনে পথে-প্রান্তরে

এমন সময় অর্থাভাবে সংসার যখন আর চলে না তখন বাবা চাকরী নিলেন বিহারের ডিহিরীতে। সংসার গেল তার সঙ্গে। ন্যাড়ার বয়স তখন আট। সেখানেও খালের ধারে ধারে ঘুরে বেড়ায় ন্যাড়া; ফাঁস এঁটে গিরগিটী ধরে, পাকা খিরনী ফল কুড়িয়ে বেড়ায়।

মতিলালের মন বসল না চাকরীতে। কিছুদিন বাদেই চাকরী ছেড়ে তিনি চলে এলেন ন্যাড়ার মামার বাড়ী ভাগলপুরে। দাদু কেদার গাঙ্গুলীর কড়া শাসনকে তুড়ি মেরে ন্যাড়া সেখানে হয়ে বসল সমবয়সী মামাদের সর্দার। পোড়োবাগানে, গঙ্গার পাড়ে লাফঝাঁপ, গাছে চড়া, টাট্টু ঘোড়া ছোটান ইত্যাদিতে রইল মেতে। অবিশ্যি এখানকার স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে অক্লেশে বৃত্তি পরীক্ষায় পাশও করে গেল সে।

ছেলের দুরন্তপনায় অতিষ্ঠ মা বাবা পরের বছরই ভাগলপুর ছেড়ে ফিরে এলেন দেবানন্দপুরে। বার বছর বয়সে ন্যাড়া ভর্তি হ'ল হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে। চল্লিশ বছর আগে বঙ্কিমচন্দ্র যে শহরে আসতেন পড়তে শরৎও সেখানে যেতে লাগল তিন মাইল পথ পায়ে হেঁটে। পড়ুয়ার দলে সে-ই পাণ্ডা। তার জমাট গল্পে পথের কষ্ট ভুলে যায় বন্ধুরা। আপন গ্রামে বাঁধন-খোলা ঘোড়ার মত আনন্দে টগবগিয়ে বেড়ায় ন্যাড়া।

মুন্সী জমিদারদের গড়ের জঙ্গলে আগাছায় ঘেরা খাদের মধ্যে ন্যাড়ার দলের আস্তানা। ওখানে বসে গল্পগুজবও চলে, আবার পরের বাগান থেকে পেড়ে আনা ফলফুলুরির শ্রাদ্ধও হয়। মাছ ধরা, নৌকো বাওয়া আর দাবা খেলায় দারুণ নেশা তার। কিন্তু মাঝে মাঝে কি যে হয় হঠাৎ সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে ন্যাড়া হয়ে যায় নিরুদ্দেশ। না খেয়ে দেয়ে ঘুরে বেড়ায় অচেনা অজানা পথে পথে। তারপর এক দিন ধুঁকতে ধুঁকতে আবার ফেরে ঘরে। একবার তো এক যাত্রাদলের সাথেই সে চলে গেল।

এই বয়সে প্রচণ্ড সাহস তার, আর মানুষের উপর দরদও খুব। পাড়াপড়শীর কারও বাড়াবাড়ি অসুখ—রাতবিরেতে ডাক্তার ডাকতে ওষুধ আনতে সে একাই ছোটে তিন মাইল দূরের শহরে, লণ্ঠন আর লাঠি হাতে। গান গাইতে গাইতে চলে যায় ঝোপ জঙ্গল পেরিয়ে। মিষ্টি

গলায় গান সে গায় ভালই, আর বেহালা বাঁশিও সে শিখেছে বাজাতে। বাইরের বই পড়ার ঝোঁকও তার প্রচণ্ড। ভাঙ্গা দেরাজ খুলে বাবার অসমাপ্ত গল্প উপন্যাসের খাতাগুলো সে পড়ে লুকিয়ে লুকিয়ে গোয়াল-ঘরে বসে। আর ভাবে—গল্পের শেষটা কি রকমের হলে ভাল হত। ভাবতে ভাবতে অনেক রাত কেটে যায় না ঘুমিয়ে।

এদিকে অভাব বাড়ে আরও। স্কুলের মাইনে জোগাতে পারেন না বাবা। তাই একদিন স্কুলে যাওয়াই বন্ধ হয়ে যায়। অভাবের তাড়নায় অবশেষে চিরদিনের মত জন্মভূমির মায়া কাটিয়ে শরৎকে মা বাবার সাথে চলে আসতে হয় ভাগলপুর। ভাগলপুর জুবিলি স্কুলের দশম শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে ভাল ভাবেই সে পাশ করল প্রবেশিকা পরীক্ষা। ট্যুইশানি করে কলেজে পড়তে শুরু করল। বই কেনার পয়সা কোথায়? পরের বই চেয়ে এনে সারা রাত পড়ে পরদিন ফেরৎ দিতে হয়। তাতেও কলেজের ফল হয় খুব ভালো। কিন্তু শেষ রক্ষা আর হয় না। ফি-এর টাকা জোগাড় করতে না পারায় শেষ পরীক্ষাটা আর দেওয়া হল না।

তিন বন্ধু

ভাগলপুরে কিন্তু তার তিনটি বন্ধু জুটল চমৎকার;—রাজু, সতীশ আর ইন্দু। রাজু—খাপছাড়া, সাহসী, দরদী—শরতেরই মনের মতো।

যমুনিয়া নদীর কিনারে বিশাল বটগাছের নদীতে হেলে-পড়া মগডালে বসে রাজু তন্ময় হয়ে ভাবে আকাশ পাতাল। স্কুল ফেরতা শরৎ গিয়ে বসে তার পাশে। বটতলায় বাঁধা থাকে রাজুর ডিঙি নৌকো। ডালে ঝুল দিয়ে তারা ছুটিতে লাফিয়ে পড়ে ডিঙিতে। বাইতে বাইতে চলে যায় বহুদূরে! অনেক রাতে আসে ফিরে। কোনদিন গভীর রাতে জেলেদের জাল থেকে আনে মাছ চুরি করে। মাছ বিক্রির টাকা বিলিয়ে দেয় গরীব দুঃখীদের।

উৎসবের রাতে পাড়ার সকলে যখন যাত্রার আসরে আনন্দে মশগুল রাজু-শরৎ তখন কলেরায় মৃত শিশুকে কোলে করে শ্মশান চলেছে দাহ করতে। পুলিশ সাহেব বিনা দোষে চাবুক মেরেছে নিরীহ পণ্ডিত-মশায়ের পিঠে। রাজু শরৎকে নিয়ে পথের দু'পাশের দুই গাছে মোটা একটা কাছি বেঁধে গভীর রাতে আছে ওঁত পেতে। ক্লাব ফেরতা মদে বেঁহুস সাহেবের ছুটন্ত ঘোড়ার গাড়ি কাছিতে বেধে উল্টে যায় হুড়মুড় করে। সাহেবকে লাথি ঘুষিতে আধমরা করে রাজু-শরৎ দেয় গা ঢাকা। রাজু বাঁশি বাজায় চমৎকার। তবলা বেহালা বাজাতেও জানে সে। রাজুর সংসর্গে শরৎ-এর বাজনায় হাতটা আরও পাকা হয়। গভীর রাতে দুই বন্ধুতে মিলে কবরখানার নির্জন আঁধারে বা ঘোষেদের পোড়ো বাগানে কিংবা যমুনিয়ার কূলে বাঁশিতে সুরের তরঙ্গ তোলে। দুই বন্ধু অভিনয়ও করে আদমপুর ক্লাবে।

কলেজের বন্ধু সতীশদের বাড়ীতেই এই ক্লাব। কলেজ ছাড়ার পর শরতের দিনরাতের আস্তানা হয়ে গেল এই বাড়ি। সতীশের বাবা নাম-করা উকিল ; বিলেত গিয়েছিলেন বলে হিন্দুরা তাঁকে একঘরে করেছে। তিনি ধার ধারেন না আচার বিচারের। রুচিবান, দিলদরিয়া লোক। বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করেছেন ক্লাব ; ক্রিকেট, বিলিয়ার্ড, ফুটবল ইত্যাদি খেলাধুলো আর গান বাজনা যাত্রা থিয়েটারের জবর আয়োজন। অভিভাবকদের বারণ না মেনে শরৎ জমে গেল সেখানে। জাত-বেজাতের তোয়াক্কা সে করে না। গান বাজনায় তো শরতের দারুণ টান, তার উপর ক্লাবের লাইব্রেরীর ইংরেজী উপন্যাসগুলোতেও মজেছে তার মন। থিয়েটারেও নেই তার জুড়ি। মেয়ে চরিত্র অভিনয় করে চমৎকার। পর পর অভিনয় করল করাল সে অনেকগুলো নাটক। একরাতে অভিনয়ের শেষে রাজু হয়ে গেল নিরুদ্দেশ ; আর তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

এদিকে আবার কলেজের আর এক বন্ধু ইন্দু ভট্টদের বাড়ীতেও

জমেছে শরতের আড্‌ডা। দাবা খেলা তো আছেই, আর আছে পড়া আর লেখা। ইন্দুর ছোট ভাই বোন পুঁটু আর বুড়ী লুকিয়ে লুকিয়ে লেখে গল্প কবিতা। শরৎদা হয়ে গেল তাদের গুরু। শরৎ আগে থেকেই শুরু করেছে একটু আধটু গল্প প্রবন্ধ লেখা। কলেজ ছাড়ার পর সে-লেখায় ডেকেছে বান। পুঁটু বুড়ীকে নিয়ে বের করেছে হাতের লেখা পত্রিকা—'ছায়া'। শরতের খাতার পর খাতা ভরে উঠতে লাগল গল্পের পর গল্পে। লেখা হয়ে গেল বোঝা, কোরেলগ্রাম, কাশীনাথ, চন্দ্রনাথ, বড়দিদি ইত্যাদি অনেকগুলি গল্প।

ঝড়ের সমুদ্রে একা

অশান্ত মন, সুখ নেই, স্বস্তি নেই। কলেজে পড়ার সময়েই অভাবে অনাহারে পুড়তে পুড়তে মা গেছেন মারা। তারপর থেকেই ছন্নছাড়া সংসার। স্ত্রীকে হারিয়ে বাবাও হয়ে গেছেন উদাসীন, আধপাগলা। খাওয়া জোটে কি জোটে না এমনি অবস্থা। বনেলির জমিদারীতে একটা সামান্য চাকরী পেলেন শরৎচন্দ্র। জমিদারের কর্মচারীর সাকরেদ হয়ে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতে হয়। কর্তাদের মন জুগিয়ে চলা বেশিদিন সইল না ধাতে। তাই চাকরী ছেড়ে ভাগলপুরে এসে বসলেন আবার। বই পড়া, গল্প লেখা, আর গান বাজনা অভিনয়ে রইলেন ডুবে। তারপর হঠাৎ একদিন সব বাঁধন কেটে শরৎচন্দ্র হলেন নিরুদ্দেশ। গেরুয়া পরে সাধু সন্ন্যাসীর দলে ভীড়ে মাসের পর মাস ঘুরে বেড়ালেন ভারতের নানা অঞ্চলে। অবশেষে ক্লান্ত দেহে, দলছাড়া হয়ে এসে উঠলেন মজঃফরপুরের এক ধর্মশালায়।

রাত গভীর, ধর্মশালার অন্ধকার ছাদে বসে আপন মনে বাজিয়ে চলেছেন বেহালা। সুরের টানে এক গান-পাগল যুবক এসে বসল তাঁর পাশে। ক্রমে বন্ধুত্ব হল। তারপরে সে-ই করে দিল মজঃফরপুরে থাকাখাওয়ার সুবন্দোবস্ত। গানে গল্পে আড্ডায় বয়ে যেতে লাগল

সন্ন্যাসী শরৎচন্দ্রের দিনগুলি। সুগায়ক হিসাবে মজঃফরপুরের বাঙালী সমাজের মন জুড়ে বসলেন তিনি। এমনি সময় হঠাৎ একদিন খবর পেলেন—বাবা আর নেই।

ছোট ছোট ভাই আর কচি বোনটিকে মানুষ করার সব দায়িত্ব এখন তাঁরই ঘাড়ে। নিজেকে মনে হল যেন দাঁড়িয়ে আছেন ঝড়ের সমুদ্রে একা। সন্ন্যাসীর ধড়াচূড়া ছুঁড়ে ফেলে ছুটলেন ভাগলপুরে। ভাইবোন তিনটিকে আত্মীয় স্বজনের কাছে রাখার ব্যবস্থা করে ভাগলপুরের পাট চুকিয়ে চলে এলেন কলকাতায়। এবার কোমর বাঁধলেন বাঁচার লড়াই লড়বার জন্য। দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের বাড়ীতে আশ্রয় একটা জুটল, চাকরীও মিলল একটা ; মাইনে মাসে তিরিশ টাকা। বড়লোক আত্মীয়ের বাড়ীতে থাকতে হয় জড়োসড়ো হয়ে। মনটা থাকে কুঁকড়ে। জীবন হয়ে উঠে দুর্বিসহ।

এমনি সময় ব্রহ্মদেশ থেকে কলকাতায় এলেন এক আত্মীয়। রেঙ্গুনের ডাকসাইটে উকিল তিনি। ওদেশে তখন অনেক বাঙালীরই বাস। চাকরীবাকরী জোটাও তেমন কঠিন নয়। দূর ব্রহ্মদেশের নানা গল্প শুনতে শুনতে শরৎচন্দ্রের ভবঘুরে মন হয়ে উঠল চঞ্চল।

চৌদ্দবছরের অজ্ঞাতবাসে

১৯০৩ সাল। জানুয়ারী মাসের এক কুয়াসাচ্ছন্ন শীতের ভোরে সকলের অজ্ঞাতে ছাব্বিশ বছরের শরৎচন্দ্র তরী ভাসালেন অকূলসাগরে। ঠিক পঞ্চাশ বছর আগে মাইকেল মধুসূদন দত্তও একদিন এমনি গোপনে চড়েছিলেন জাহাজে। রেঙ্গুনে পৌঁছে শরৎচন্দ্র উঠলেন সেই আত্মীয়েরই বাসায় ; তিনিই করে দিলেন একটা ছোটখাটো চাকরী। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই আত্মীয় ভদ্রলোক গেলেন মারা, তাঁর বাসাও গেল উঠে। শরৎচন্দ্র ভেসে বেড়াতে লাগলেন এখানে ওখানে। কখনও চাকরী করেন, কখনও চাকরী থাকে না ; আবার কখনও ভাল লাগে না—

নিজেই ছেড়ে দেন চাকরী—ভবঘুরে হয়ে ঘুরে বেড়ান ব্রহ্মদেশের শহরে গ্রামে পথে পথে। আলাপে গানে মুগ্ধ হয়েই অনেকেই তাঁর বন্ধু হয়ে ওঠে। বছর চারেক কেটে যায় এই ভাবে।

অবশেষে একটা সরকারী চাকরী পেয়ে শরৎচন্দ্র পাকাপোক্ত হয়ে বাসা বাঁধেন রেঙ্গুনে। কিন্তু ধনী, মানী ভদ্রলোকদের সঙ্গে তিনি নিলেন না। কলকারখানার নিপীড়িত নিরক্ষর শ্রমিকদের বস্তিতে এসে বাসা করলেন। মিশে রইলেন তাদেরই সাথে ; প্রাণ উজাড় করে ভালবাসলেন তাদের। বিপদে আপদে রোগে শোকে তাদের আপনজন—দাদাঠাকুর হয়ে গেলেন তিনি। হোমিওপ্যাথীর বই পড়ে ওষুধ দেন, লিখে পড়ে দেন চিঠি দরখাস্ত, কলেরা বসন্ত রোগীকে রাত জেগে শুশ্রূষা করেন। আবার সন্ধ্যায় এদের নিয়ে আসর জমিয়ে গানবাজনাও করেন।

রেঙ্গুনে গাইয়ে বলে তাঁর সুনাম। কবিবর নবীন সেন তাঁর গান শুনে মোহিত হয়ে তাঁকে 'রেঙ্গুন-রত্ন' উপাধিতেই ভূষিত করলেন। নিজে যে কোনদিন লেখায় হাত দিয়েছিলেন তা ভুলেই গিয়েছেন একেবারে ; কিন্তু শত ঝড় ঝাপ্‌টার মধ্যেও পড়তে ভোলেননি একদিনের জন্যেও। লাইব্রেরী থেকে রাশি রাশি বই এনে পড়েন রাত জেগে। বিজ্ঞানের বই, দর্শনের বই, মায় ছবি আঁকার বই পর্যন্ত। মাঝে মাঝে ছবিও আঁকেন। ছবি আঁকায় বেশ হাত ছিল তাঁর। বছরের পর বছর কেটে যায় এইভাবে।

১৯০৭ সাল। ব্রহ্মদেশে অজ্ঞাতবাসের পাঁচ বছর চলছে ; এমন সময় একদিন অবাক হয়ে শুনলেন কলকাতার বিখ্যাত "ভারতী" পত্রিকায় নাকি তাঁর 'বড়দিদি' গল্প ছাপা হয়েছে। অথচ গত দশ বছরের মধ্যে এক 'মন্দির' নামে একটা গল্প ছাড়া আর কিছুই লেখেননি শরৎচন্দ্র। ব্রহ্মদেশ আসার ঠিক আগের দিন এক সমবয়সী মামার অনুরোধে এই 'মন্দির' গল্পটা তিনি লিখেছিলেন একটা প্রতিযোগিতার

জন্য। গল্পটা প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছিল এবং ছেপেও বেরিয়েছিল। ব্রহ্মদেশে বসে পেয়েছিলেন সে-খবর। সেটাই শরৎচন্দ্রের প্রথম মুদ্রিত রচনা।

ভারতীতে প্রকাশিত 'বড়দিদি' গল্পটা তাঁর পুরোনো খাতা থেকে নিয়ে ছাপিয়ে দিয়েছেন এক বাল্য বন্ধু। খ্যাতনামা শরৎচন্দ্র দেশ ছাড়ার সময় ফেলে রেখে এসেছিলেন বন্ধুদেরই কাছে। শরৎচন্দ্রকে না জানিয়ে তারাই এ কাজ করেছে। 'বড়দিদি' তো তিন মাস ধরে খানিকটা খানিকটা করে বের হল। প্রথম দু'মাসে লেখকের কোন নাম ছাপা হয় নি। অনেকেই ভেবে নিয়েছিল লেখাটা রবীন্দ্রনাথের। 'বড়দিদি' বেরুতে চারিদিকে হৈ হৈ পড়ে গেল। কিন্তু ছোটবেলার লেখা এইভাবে ছাপতে রাজী নন শরৎচন্দ্র। অথচ বন্ধুরা তা শোনে না। খাতা থেকে নিয়ে তারা পর পর প্রকাশ করে দিল বোঝা, কাশীনাথ ইত্যাদি বেশ কয়েকটা গল্প।

তবুও পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত শরৎচন্দ্র নতুন করে ছুঁলেন না আর সাহিত্যের কলম। কেরানীর একঘেঁয়ে জীবনের বৈঠা বেয়েই চললেন। ১৯১২ সালের শেষ দিকে একমাসের ছুটি নিয়ে কলকাতায় এলেন ভাইবোন আর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করতে। বন্ধুবান্ধবরা তো তাঁকে ঘেরাও করে ফেললে—নতুন লেখা না লিখিয়েই ছাড়বে না। অবশেষে শরৎচন্দ্রকে প্রতিশ্রুতি দিতেই হ'ল—ব্রহ্মদেশ থেকে নিয়মিত লেখা পাঠাবেন।

বঙ্গে শরৎ

পনের ষোল বছরের ব্যবধানে আবার কলম ধরলেন শরৎচন্দ্র। 'যমুনা' পত্রিকায় একে একে প্রকাশিত হ'ল—বিন্দুর ছেলে, রামের সুমতি, পথনির্দেশ গল্প। এক একটা গল্প বেরোয়, আর আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায় পাঠকেরা। দিগ্বিজয়ী বীরের মত পাঠকের মনজয়

করেই চলেছেন তিনি। প্রকাশিত হতে থাকে বিরাজবৌ, পণ্ডিতমশায়, আর চরিত্রহীন উপন্যাস। পত্রিকার লেখা বই হয়ে বেরুতেই বিক্রী হতে লাগল থো থো করে। যাঁকে নিয়ে এত হৈ হৈ রৈ রৈ, তিনি কিন্তু আরও চার বছর রয়ে গেলেন সকলের অগোচরে।

বয়েস চল্লিশ পেরুলো। একটানা দুঃখ, তাপ, ঝড় ঝাপ্টার মধ্য দিয়ে পেরিয়ে এসেছেন এই চল্লিশটি বছর। শরীর আর বইছে না। মাঝে মাঝেই পড়ছে ভেঙে ; ইংরেজের গোলামীর চাকরীও আর সইতে পারছেন না। তাই চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে চৌদ্দ বছরের অজ্ঞাতবাস ছেড়ে অবশেষে দেশে ফিরলেন শরৎচন্দ্র। সঙ্গে এলেন স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবী আর—সন্তানতুল্য ভেলু আর বাটু। ভেলু তাঁর প্রিয় কুকুর আর বাটু তাঁর পোষা পাখি। অসম্মান আর অবহেলার বোঝা কাঁধে নিয়ে যিনি একদা দেশত্যাগী হয়েছিলেন তিনি ফিরে এলেন বাংলার নরনারীর প্রাণের প্রিয় সাহিত্যিক রূপে।

বাসা করলেন হাওড়া শহরের বাজে শিবপুর পাড়ায়। লেখাই হল তাঁর জীবিকা। বাজে শিবপুরের বাসা হয়ে উঠল সাহিত্যের মন্দির। দলে দলে সাহিত্যিকরা আসতে লাগলেন তাঁর সঙ্গ পেতে ; পত্রিকার সম্পাদকরা দিনরাত ধর্ণা দিতে থাকলেন তাঁর লেখার জন্য ; আর তাঁর লেখায় আত্মহারা পাঠকরা এলেন শ্রদ্ধা জানাতে। শরৎচন্দ্র পর পর লিখে গেলেন পল্লীসমাজ, বৈকুণ্ঠের উইল, শ্রীকান্ত, দত্তা, গৃহদাহ ইত্যাদি উপন্যাস। শ্রদ্ধা সম্মান ভালবাসা পেলেন ভুরিভুরি।

১৯২০ সালে দেশের স্বাধীনতার আন্দোলনে এলো জোয়ার। শরৎচন্দ্র কলম ছেড়ে উঠে পড়লেন। সাহিত্যিক-বন্ধুরা হৈ হৈ করে উঠলেন। একি ? সাহিত্য ছেড়ে সত্যাগ্রহ! কোন কথায় কান দিলেন না শরৎচন্দ্র। পীড়িতের বন্ধুর কাছে নিপীড়িতের মুক্তির চেয়ে বড় কাজ আর কি আছে। শরৎচন্দ্র হলেন হাওড়া জেলা কংগ্রেসের

সভাপতি, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বন্ধু ও ভক্ত। হাওড়ার কাজ সেরে প্রত্যহ আসেন কলকাতার খাসদপ্তরে। গভীর রাতে ফেরেন ঘরে। কংগ্রেসের সঙ্গে দেশবন্ধুর মতের অমিল হল, তিনি স্বরাজ্য দল গড়লেন; শরৎচন্দ্রও যোগ দিলেন তাতে।

দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর কংগ্রেসের দলাদলিতে বিরক্ত হয়ে শরৎচন্দ্র আবার লেখায় মন দিলেন। এবার দেশের স্বাধীনতা নিয়ে লিখলেন প্রাণে আগুন জ্বালানো উপন্যাস 'পথের দাবী'। সরকার এ বই ছাপা রাখা বা পড়া বেআইনী করে দিল। শ্রমিক মজুরদের উপর তাঁর ভালবাসা, বিপ্লবীদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ফুটে উঠেছে এ-বইয়ের পাতায় পাতায়। বিপ্লবীদের তিনি নানাভাবে সাহায্য করেছেন সারাজীবন। গরীবদের বাঁচার লড়াইয়ে তিনি দিয়ে গেছেন প্রাণভরা আশীর্বাদ।

সামতার দাদাঠাকুর

ছেলেবেলা থেকে মাঠ ঘাট নদী জঙ্গল যাঁর রক্তের সাথে মিশে আছে তিনি আর কতকাল শহরের ইট কাঠ পাথরের পাঁচিলে আটকা থাকবেন। প্রাণ যে হাঁপিয়ে ওঠে। গ্রামের সহজ সরল নিঃস্ব মানুষদের সাথে প্রাণ খুলে মিশতে না পারলে যে স্বস্তি পান না। তাই দশবছর শিবপুরে কাটিয়ে শরৎচন্দ্র অবশেষে চলে এলেন হাওড়া জেলার সামতাবেড়ে গ্রামে। রূপনারায়ণের কূলে তৈরী করালেন মাটির দোতলা বাড়ী। গ্রামের গরীব মানুষের কাছে গেলেন মিশে। আবার হলেন দাদাঠাকুর, অভাবে অভিযোগে বিপদে আপদে গরীবের ভরসা। আবার হাতে নিয়েছেন হোমিওপ্যাথীর বাক্স। এমন কি পথ্যও কিনে দেন গরীবদের। বিকেলে হাঁটতে হাঁটতে চলে যান খেলার মাঠে। খেলার পর গরীব ছেলেগুলিকে নিজহাতে খাওয়ান জলখাবার।

বর্ষার প্রবল বৃষ্টিতে বান এসেছে রূপনারায়ণে। রাতদুপুরে খবর পেলেন—বাঁধ ভেঙে সব ধানক্ষেত ডুবে যায় বুঝি। সেই রাতে চাষীদের

ডাকিয়ে এনে বৃষ্টি মাথায় ছুটলেন বাঁধ মেরামত করতে। নিজেও লেগে গেলেন মাটি বইতে। গাঁয়ের গরীবরা একদিন এসে কেঁদে পড়ল—যে খালের মাছ ধরে তারা পেট চালায় সেই বারোয়ারী খাল দখল করে নিয়েছে জমিদারবাবু। শরৎচন্দ্র তাদের নিয়ে মামলা চালালেন জমিদারের বিরুদ্ধে। অনেক হাঙ্গামা হুজ্জৎ গেল তাঁর মাথার উপর দিয়ে। শেষ পর্যন্ত জয় হল গ্রামবাসীর।

গ্রামের মানুষের প্রাণ-উজাড় ভালবাসা পেলেন শরৎচন্দ্র। কিন্তু গ্রামের জমিদার মোড়লেরা তাঁর উপর চটে টং। এদের নোঙ্‌রামি যে তিনি খুলে ধরেছেন তাঁর গল্প উপন্যাসে। তাই তারা তাঁকে একঘরে পর্যন্ত করল। কিন্তু জাতবেজাতের তোয়াক্কা করেন না শরৎচন্দ্র। গরীব দুঃস্থদের সাথে মিশে মহাসুখে দিন চলতে লাগল তাঁর। দেশের নানাস্থান থেকে দলে দলে লোক আসে এই দূর পাড়াগায়ে তাঁকে দেখতে, তার সাথে আলাপ করতে। সামতেবেড়ে পরিণত হয় তীর্থ-স্থানে। এখানে বসে শরৎচন্দ্র লিখলেন বিপ্রদাস, শেষপ্রশ্ন, শ্রীকান্তের শেষপর্ব ইত্যাদি উপন্যাস।

বিদায় বেলায়

বয়স বাড়ছে, শরীরও পড়ছে খুবই ভেঙে। দুই মাইল দূরের দেউলটি স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরে কলকাতায় যাওয়া বড়ই কষ্টকর হয়ে পড়ছে। অথচ যেতেই হয়; সভা সমিতি থেকে ডাক আসে, বই ছাপাও হয় কলকাতায়। অগত্যা ঠিক করলেন কলকাতাতেই থাকবেন। সাতান্ন বছর বয়সে তাই বাড়ী করলেন বালীগঞ্জে। তবু গ্রামের টানে মাঝে মাঝেই চলে যান সামতাবেড়েয়।

মাত্র পঁচিশ বছরের সাহিত্যসাধনায় সম্মান, শ্রদ্ধা, ভালবাসা তখন তাঁর মাথায় অঝোরে পুষ্পবৃষ্টি করছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দিয়েছে পুরস্কার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর কপালে পরিয়ে দিল

জ্ঞান-বিদ্যার সবচেয়ে বড় উপাধির তিলক। তিনি তো প্রথমে উপাধি নিতেই চান না। বলেন—কলেজের পরীক্ষায় কোনদিন তো পাশই করলাম না, তবে কেন আমাকে ডি. লিট ডিগ্রী দেওয়া। শেষ পর্যন্ত অনুরোধে উপরোধে রাজী হলেন।

ষাট বছর পূর্ণ হতে বিরাট করে পালিত হল শরৎজয়ন্তী। শরীর তখন একেবারেই ভেঙেছে। ষাষট্টির জন্মদিনে সংবর্ধনার উত্তরে বল্‌লেন—'এবার জীবনের সন্ধ্যা এল গড়িয়ে। আবার যদি ৩১শে ভাদ্র ফিরে আসে, দেখা হবে। নইলে—বিদায়।'

আর ফিরে এল না ৩১শে ভাদ্র। ১৯৩৮ সালের ১৬ই জানুয়ারী চিরবিদায় নিলেন বাংলার প্রিয়তম সাহিত্যিক। বিশ্বকবি অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বললেন—'দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে বরি।'

[পাঁচ]

বন্দীশালায় বসন্ত

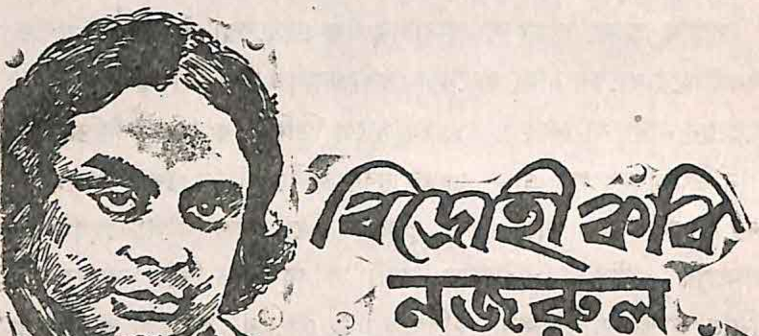
সম্মান, শ্রদ্ধা, ভালবাসা জানাবার জন্য লেখকেরা তাঁদের লেখা বই উৎসর্গ করে থাকেন নানা জনকে। রবীন্দ্রনাথও তাঁর বিভিন্ন বই উৎসর্গ করেছেন নানা ব্যক্তিকে। ১৯২২ সালে তিনি তাঁর 'বসন্ত' গীতিনাট্য-খানি উৎসর্গ করলেন এমন একজন যুবক কবিকে যিনি তখন কারাগারে বন্দী। কবিগুরু তাঁর এক দূতকে দিয়ে বইখানি পাঠিয়ে দিলেন আলিপুর জেলে। এইভাবে বন্দী কবির উন্নত শিরে বসন্তের ফুল ছড়িয়ে আশীর্বাদ করলেন কবিগুরু। জেলের ইংরেজ কর্তা আর কারারক্ষীরা তো বিস্ময়ে হতবাক্—একজন কয়েদীর নামে বই উৎসর্গ করেছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। তারা অবাক হয়ে প্রশ্ন করে—কয়েদী কি এতই মহৎ এক ব্যক্তি।

অবাক হলে কি হবে, কবিকে তারা জেল থেকে জেলে নিয়ে যায় মাজায় দড়ি, হাতে কড়া, পায়ে বেড়ী পরিয়ে; তাঁর উপর চলে অত্যাচারের উপর অত্যাচার; হাতে পায়ে শিকল বেঁধে আটক রাখা হয় নির্জন কুঠরীতে। কারণ—কবি সত্যি সত্যিই বসন্তের হাওয়া বইয়ে দিয়েছেন বন্দীশালার অন্ধপুরীতে। জেলের শাসন অগ্রাহ্য করে গানে কবিতায় মাতিয়ে তুলেছেন কয়েদী ও রাজবন্দীদের।

নির্যাতনের প্রতিবাদে কবি অবশেষে শুরু করলেন অনশন। এক-মাস কেটে যায় অনাহারে; বিদ্রোহী কবি মাথা উঁচু করে এগিয়ে চলেন মৃত্যুর দরজায় দিকে। রবীন্দ্রনাথ তখন শিলং-এ। খবর পেয়ে সেখান

থেকে তিনি টেলিগ্রাম করে বাইশ বছরের কবিকে বললেন—'অনশন ত্যাগ কর, আমাদের সাহিত্যের জন্য চাই তোমাকে।'

এই কবিরই নাম কাজী নজরুল ইসলাম। মাত্র বছর দুয়েক আগে কলম ধরেছেন তিনি। আর তাতেই কাঁপন ধরেছে ইংরেজ রাজের বুকে। তাই তারা তাঁর হাতে পরিয়েছে শেকল।



ব্যাঙাচি কবি

'আমার এই ব্যাঙাচি কবি একদিন সাপ হয়ে ছোবল মারবে'—বলেছিলেন দুখু মিঞার গানের গুরু। নাম তাঁর ওস্তাদ চাকর গোদা। ওস্তাদের ছিল অদ্ভুত ক্ষমতা। যে কোন ঘটনা নিয়ে পদ্যে যাত্রার পালা বানিয়ে ফেলতে পারতেন, আর মুখে মুখে গান বেঁধে তাতে সুর দিতেন। তিনি ছেলেবেলা থেকে দুখুকে শিখিয়েছিলেন মুখে মুখে ছড়াকাটা আর গান বাঁধা। দশ বছর বয়সেই দুখু এমন কবিতা বানানো শিখেছিল যে ওস্তাদ তাকে মাইনে দিয়ে ভর্তি করে নিয়েছিলেন নিজের লেটো গানের দলে। লেটো বা নট্ট গান হচ্ছে নাটুকে গান; যাত্রাগানের মতই গানে কবিতায় গাঁথা নাটক।

আট বছর বয়সে দুখুর বাবা গেলেন মারা ; বিধবা মা ছেলেপিলের ভাত জোটাতে পারেন না এমন অবস্থা। তাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়াটুকু শেষ হওয়ার পরই দুখুকে রোজগারের চেষ্টায় নামতে হল। প্রথমে নিজের পাঠশালা বা মক্তবেই সে করল মাস্টারি। তারপর দশ বছর বয়সে এসে ঢুকলো লেটোর দলে। পালার পর পালা সে লিখল। গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে, দরাজ গলায় গান গেয়ে আসর মাত করতে লাগল। অবশেষে তের বছর বয়সে একদিন সব ছেড়েছুড়ে পালিয়ে গেল বাড়ী থেকে।

এই বিবাগী ছেলেই যে বাংলার প্রাণে মনে বিদ্রোহের আগুন জ্বালাবে কে-ই বা ভাবতে পেরেছিল সে কথা। কে-ই বা ভেবেছিল সে-ই হবে হিন্দু মুসলমানের মিলনের সাঁকো—কাজী নজরুল ইসলাম।

জন্ম হয়েছিল তার ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে মে, বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে। বাবা কাজী ফকির আহমদ্ ছিলেন বাংলা ও ফারসী কবিতার সমঝদার। কিন্তু ছেলেবেলাতেই বাবাকে হারিয়েছিল নজরুল। তাই তিন ছেলে আর দুই মেয়েকে মানুষ করার দায়িত্ব নিতে হয়েছিল মা জাহেদা খাতুনকেই।

দুখু মিঞা

চার ছেলে মারা যাওয়ার পর জন্ম বলে নজরুলকে সবাই ডাকত দুখু বলে। কেবল তাও নয়, ছেলেবেলা থেকেই পরের দুঃখে কাতর হত বলেও দুখু নামটা তার স্বভাবের সাথে মিলে গিয়েছিল। তাদের বাড়ীর পূর্বে ছিল একটা উঁচু ঢিবি—আসলে ওটা পুরাকালের এক হিন্দু রাজার দুর্গ—নরোত্তম সিংহের গড়। বাড়ীর দক্ষিণে ছিল এক মুসলমান সাধুর তৈরী পুকুর আর মসজিদ ; পুকুর পাড়ে ছিল ঐ সাধুরই কবর-বেদী বা মাজার। এই গড়, মসজিদ, মাজারে উদাস হয়ে ঘুরে বেড়াত

বালক দুখু। মাজারে জ্বালাত সন্ধ্যা প্রদীপ, মসজিদে দিত আজান। কথকতা, কীর্তন, যাত্রা, কোরানশরিফ পাঠ-এর আসরে বসে সে যেত তন্ময় হয়ে। তাই ছেলেরা ঠাট্টা করে তার নাম দিয়েছিল তারা ক্যাপা।

দুখুর কাকা কাজী বজলে করিম ছিলেন সত্যিকারের পণ্ডিত লোক। ফারসী আর বাংলা দু'ভাষাই তিনি ভাল জানতেন ; কবিতা লেখাও চর্চা করতেন। তাঁরও ছিল লেটোর দল। তবে হাসি তামাসার হাল্কা পালা তিনি গাইতেন না। বাইরে বাইরে পালা গেয়েও বেড়াতেন না। তিনি ছিলেন উঁচু মনের মানুষ, বড়ো ভাবের ভাবুক। দুখুর কবিতা লেখার ঝোঁক এসেছিল তাঁকে দেখেই। তাঁর দলেও সে ছিল কিছুকাল। কিন্তু খাওয়া জোটে না যে। তাই বেরুতে হল রোজগারের ধান্ধায়।

গাঁয়ের মক্তবে খুব ভালভাবেই সে নিশ্চয় পাশ করেছিল নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষা, তা না হলে কি পাশ করেই সেখানে গুরুগিরির চাকরি পেল ন'বছর বয়সে। এক বছর গুরুগিরি করার পর চাকর গোদার দলে ভিড়ে সে লিখে ফেলল অনেকগুলো নাটক, প্রহসন— শকুনীবধ, রাজপুত্র, চাষার সং, মেঘনাদবধ, আকবর সা, দাতাকর্ণ, কবি কালিদাস, ঠগ্‌পুরের সং ইত্যাদি। তার গান বাঁধা আর গাওয়া, সুর দেওয়া আর শেখারও সূত্রপাত এই লেটোর দলেই। বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়ার গ্রামে গ্রামে দিনের পর দিন সে গেয়ে বেড়িয়েছে এই সব গান। এই বয়সেই পালা লিখিয়ে হিসেবে তার খুব নাম-ডাক হয়েছিল।

উদাসী পথিক

কিন্তু এমন জীবনে বাঁধা পড়তে চাইল না তার মন। তের বছর বয়সে ঘর সংসার, মা ভাই বোনের সকল বাঁধন কেটে ফেলে সে হল পলাতক। একদিন পথের ধারে বসে লেটোর দলে গাইছিল সে গান, রেলের এক গার্ড সাহেব যাচ্ছিলেন পথ দিয়ে ; বাচ্চা ছেলের গান শুনে ভাল লেগে গেল ; দেখলেন—যেমন সুশ্রী চেহারা—সুন্দর স্বাস্থ্য,

বড়ো বড়ো চোখ, চওড়া বুকের ছাতি, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল—তেমনি দরাজ গলা। গার্ড সাহেব দুখুকে ডেকে নিয়ে গেলেন প্রাসাদপুরে। দুখু হল গার্ড সাহেবের খানসামা। তিনি ছোট ভাই-এর মতই ভালবাসতেন তাকে। কিন্তু এখানেও মন বসল না দুখুর।

চাকরী নিল সে আসানসোলের এক রুটির দোকানে। মাসে মাইনে পাঁচ টাকা। উদয়াস্ত ভূতের খাট্‌নী খাটতে হয়। তার উপর মালিকটা একটা আস্ত যমদূত; লিখতে পড়তে গান গাইতে দেখলেই মারমুখো। এই দোকানে থাকতে থাকতেই দুখুর পরিচয় হল আসানসোল থানার দারোগা কাজী রফিউদ্দীন সাহেবের সঙ্গে। দুখুর কথাবার্তা গান শুনে রফি সাহেব ভালবেসে ফেললেন চৌদ্দ বছরের ছেলেটাকে। কাজ ছাড়িয়ে তাকে সাথে করে নিয়ে গেলেন তাঁর নিজের দেশ মৈমনসিং-এ।

দুখুকে তিনি ভর্তি করে দিলেন দরিরামপুর স্কুলে। ছ'বছর বাদে আবার ছাত্র হল নজরুল। পড়ায় তার গভীর মনোযোগ। স্কুলের মাইনে তো মকুব হল। কিন্তু নিজে বই কিনবে কোত্থেকে, পরের বই এনে রাত জেগে সে পড়ে। কবিতা লেখে বলে ছাত্রদের সে প্রিয়। পরীক্ষাতেও সে হল প্রথম। বাংলা প্রশ্নের সব উত্তরগুলোই লিখে দিলে পদ্যে। কিন্তু হেডমাস্টার মশায় চলে গেলেন স্কুল ছেড়ে। পড়ায় পড়ল বাধা। সে-ও চলে এল মৈমনসিং ছেড়ে। ফিরল আপন দেশে।

মুক্তির সন্ধানে

রাণীগঞ্জে শিয়াড়শোল রাজ স্কুলে পড়ার একটা ব্যবস্থা হল। মেধাবী ছাত্র নজরুলের বিনা পয়সায় পড়া, থাকা, খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন শিয়াড়শোলের রাজারা। ওঁরা ছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থক। মুসলিম ছাত্রাবাসে থাকে দুখু, আর পড়ে সেকালের থার্ডক্লাসে, একালের অষ্টম শ্রেণীতে। এখানেও পরীক্ষায় হয় প্রথম। ভারী মধুর স্বভাব তার; খেলাধুলোতেও দারুণ তুখোড় সে; চেহারাটাও শক্ত সমর্থ

বলিষ্ঠ। এদিকে জয়দেব চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির পুরানোকেলে কবিতা পর্যন্ত সে পড়ে ফেলেছে। রবি ঠাকুরের কবিতা পেলে আর রক্ষে নেই; রবি ঠাকুরের নামেই পাগল সে, ছবি টাঙিয়ে রেখেছে ঘরে, রোজ ধূপধুনো ফুল দিয়ে পূজো করে। রবি ঠাকুরের নিন্দে করলে রেগেই আগুন হয়। একদিন খেলার মাঠে তাকে ক্ষেপানোর জন্যে এক বন্ধু রবি ঠাকুরের নিন্দে শুরু করল। রাগ সামলাতে না পেরে নজরুল গোলপোস্ট উপড়ে নিয়ে এসে তার মাথায় দিলো সজোরে বাড়ি। মাথা ফেটে রক্তে রক্ত হয়ে গেল।

এখন সে লেখে গল্প, নাটক, প্রবন্ধ। বন্ধু পেয়েছে সে রাণীগঞ্জ হাইস্কুলের একই ক্লাসের ছাত্র শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়কে। শৈলজাও লেখে, তবে কবিতা। ছুটিতে মিলে ঘুরে বেড়ায় শিশু শালের বনে, রেল লাইনের ধারে, নির্জন গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে। শৈলর অনুরোধে নজরুল আবার লিখতে শুরু করল কবিতা। নজরুলের কবিতা নাটক গল্প লেখার কথা রটে যায় শিক্ষক ছাত্রদের মধ্যে। শিক্ষক সতীশ কাঞ্জিলাল সঙ্গীতের অনুরাগী। নজরুলের সঙ্গীত চর্চাকে তিনি দেন উৎসাহ। আর ছাত্রদের প্রিয় শিক্ষক নিবারণ ঘটক নজরুলকে লেখায় করেন সাহায্য, দেন উপদেশ। ক্রমে ক্রমে নজরুলকে তিনি টেনে নেন নিজের গায়ের কাছে। ইংরেজ তাড়ানোর গুপ্ত দলের কর্মী ছিলেন তিনি। তাঁরই কাছে দেশপ্রেমের দীক্ষা পেল নজরুল। দেশের মুক্তির চিন্তায় তার মন গেল মজে।

পঞ্চু নামে এক ধনী বন্ধুকে দিয়ে সে কেনাল একটা পাখি-মারা বন্দুক—এয়ার গান। স্কুল থেকে ফিরে সে আর শৈল ঐ এয়ার গান ঘাড়ে করে চলে যায় শহরের একপ্রান্তে—সাহেবদের নির্জন কবরখানায়। বৃটিশরাজের চরদের মেরে দেশছাড়া করার জন্য সে হাতের টিপ্ শিখতে থাকে সেখানে! কবরের বেদীগুলোর কোনটাকে বড়লাট, কোনটাকে

ছোটলাট, কোনটাকে ম্যাজিষ্ট্রেট ঠিক করে নেয় প্রথমে, তারপর এক একটাকে গুলি বিঁধিয়ে ইংরেজ মারার আনন্দে আত্মহারা হয়। এইভাবে মনের ভেতর স্বাধীনতার সঙ্কল্প তার হয় দৃঢ়।

শিয়ারশোল স্কুলে তিন বছর পড়ে দশম শ্রেণীতে প্রি-টেস্ট পরীক্ষায় ফার্স্ট হল সে। দুনিয়া জোড়া যুদ্ধের ডামাডোল চলছে তখন চারিদিকে। এদিকে নিবারণবাবুকে ধরে নিয়ে গেছে পুলিশে। এখন কি করবে—ভাবতে ভাবতে নজরুল ঠিক করে ফেললো—সে সৈনিক হয়ে যুদ্ধে যাবে। ইংরেজকে তাড়াতে হলে যুদ্ধ বিদ্যাটা না শিখলেই নয়। ভেতো বাঙালীর ভীরু অপবাদটাও ঘোচানো চাই। তাই প্রবেশিকার দোরগোড়ায় এসে পড়াশুনোয় দাড়ি টেনে দিয়ে নজরুল নাম লেখাল বাঙালী পল্টনে। আঠারো বছরে পা দিয়েছে সে তখন ; কিন্তু শরীর তার বাড়-বাড়ন্ত আর স্বাস্থ্যও দারুণ। তাই সৈন্য বিভাগে স্থান পেতে তার কোনই অসুবিধা হ'ল না। হৈ হৈ করতে করতে সে বাংলা দেশ ছেড়ে গেল সুদূর আরব সাগরের তীরে করাচীর সেনা নিবাসে।

হাবিলদার কবি

বাঙালী ছেলেদের নিয়ে এ-সেনাবাহিনী ; তাই নাম বাঙালী পল্টন। বাঙালী পল্টনের ছেলেরা নজরুলকে পেয়ে খুব খুশী। হৈ হুল্লোড়ে সে মাতিয়ে তোলে সবাইকে। আঠারো বছরের কৈশোর তার শক্তিতে স্ফূর্তিতে টগবগ করছে। দিলদরাজ, নিরহঙ্কার সে শিশুর মতো। প্যারেড করে, অস্ত্র শিক্ষা নেয় সে গভীর নিষ্ঠাভরে। কিন্তু প্যারেড করতে করতে যে পড়ার সময় মেলে না একদম। তাই ধরে করে সৈন্য-বাহিনীর পোষাকখানার রক্ষকের কাজটা নিল সে জোগাড় করে। গুদামঘরই হল কোয়ার্টার-মাস্টার হাবিলদার নজরুলের সারাদিনের আস্তানা। চুপি চুপি তার মধ্যে বসে লেখাপড়া করার দিব্যি ব্যবস্থা করে ফেলল সে।

পাহাড় প্রমাণ পোষাক আসাক, বুট মোজার আড়ালে হল তার গোপন পাঠস্থান। প্রায় সমস্ত বাংলা পত্রপত্রিকা সে আনায় ডাকে; রবীন্দ্রনাথ আর শরৎচন্দ্রের বইপত্র আর রবীন্দ্র সংগীতের স্বরলিপি ছিল তার সদা সঙ্গী। সন্ধ্যা বেলায় ব্যারাকে তার ঘরের সামনে বসে আসর। গান বাজনা গল্প গুজব হাসি হুল্লোড়ের সে এক মহোৎসব। নজরুল হাঁক ছাড়ে—দে গরুর গা ধুইয়ে; মানে—মন প্রাণের মলিনতা ঘুচিয়ে দাও; আর হাসিতে ফাটায় আকাশ। অরগ্যান, ব্যাঞ্জো, ক্ল্যারিঅনেট, বেহালা, বাঁশি ইত্যাদি সব রকমের বাজনা তারা সংগ্রহ করেছে। নজরুল এখানে নানারকমের বাজনা বাজাতে শিখেছিল।

সৈন্যবাহিনীতে আসেন একজন পাঞ্জাবী মৌলবী। বড় উদার লোক তিনি, ফারসী ভাষায় পাণ্ডিত। এঁকে পেয়ে নজরুল লেগে গেল ভাল করে ফারসী পড়তে। ফারসী শিখে সে একে একে পড়ে ফেলল ঐ ভাষার সেরা সেরা কবিতার বই। বিশ্ববিখ্যাত কবি হাফিজের কাব্য পড়ে গ্রামের কবিয়াল নজরুলের চিন্তা ভাবনা আরও সুশ্রী সুন্দর হল। পোষাকের স্তূপের আড়ালে বসে গল্প কবিতা লিখে কলকাতার পত্রিকায় পাঠাতে লাগল হাবিলদার নজরুল। 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় প্রথম ছাপা হ'ল তার কবিতা আর গল্প। ঐ পত্রিকায় সহ-সম্পাদক মুজফ্‌ফর আহমদ সেগুলো পড়ে বুঝলেন—এ লেখকের মধ্যে শক্তি আছে। তাই তিনি চিঠি লিখে লিখে হাবিলদার কবিকে উৎসাহ দিতে থাকলেন। দুজনের মধ্যে চিঠিতে চিঠিতে বন্ধুত্ব বেশ জমে গেল।

ধূমকেতুর উদয়

তিন বছর বাদে বাঙালী পল্টন তুলে দিল বৃটিশ সরকার। নজরুল ফিরলেন বাংলায়। মুজফ্‌ফর নিজের কাছে ডেকে নিলেন নজরুলকে। দুজনের কারুরই নেই চালচুলো। থাকেন পত্রিকার অফিসে। দুজনে

ঠিক করলেন—তাঁরা দেশকে জাগানোর জন্যে লিখবেন, পত্রিকা বার করবেন আর দেশের মুক্তির লড়াই-এ নিজেদের করবেন উৎসর্গ।

অনেক কষ্টে টাকাকড়ি সংগ্রহ করে মুজফ্‌ফর আর নজরুল মিলে বের করলেন 'নবযুগ' পত্রিকা। রোজ সন্ধ্যেবেলায় এক পাতার পত্রিকাখানা বেরোয়। নজরুলের আগুনে লেখায় গায়ে জ্বালা ধরল সরকারের। বার বার জরিমানা হতে থাকল। ফলে টাকার অভাবে উঠেই গেল পত্রিকা। পত্রিকা উঠে গেলে কি হবে, নজরুল তো তখন বেশ নাম করেছেন লেখায়। সুতরাং তাঁর কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ছাপা হতে থাকল নানা পত্রিকায়। আর তাঁর দুর্দান্ত গানের আর প্রাণের শেকলে বাঁধা পড়ল অনেক কবি সাহিত্যিক। এরই মাঝে 'বিজলী' পত্রিকায় বের হল তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতা। ব্যস, পরাধীন প্রাণে দাউ দাউ করে আগুন জ্বালিয়ে দিলেন নজরুল। মাত্র বিশ মাস আগে কলকাতায় এসেছেন যিনি তিনিই হয়ে দাঁড়ালেন যুবকদের প্রাণের রাজা। চারিদিকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকল—'বল বীর বল চির উন্নত মম শির।' নজরুলের বয়স তখন বাইশ চলছে।

কিছুদিনের মধ্যেই কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে নজরুল আবার বের করলেন পত্রিকা। নাম—ধূমকেতু। সপ্তাহে দুবার বেরোয়, দাম এক পয়সা। পরাধীনতার শেকল ভাঙ্গার ডাক দিয়ে নজরুল তাতে লেখেন প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, ব্যঙ্গ রচনা, দেশ বিদেশের খবরাখবর আর সম্পাদকীয়। কেনবার জন্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়, দল বেঁধে লোকে পড়ে। এই পত্রিকার পূজো সংখ্যায় নজরুল লিখলেন এক লম্বা কবিতা—'আনন্দময়ীর আগমনে'। এই কবিতায় সরকার একেবারে ক্ষিপ্তই হ'ল, জারি করল নজরুলকে গ্রেপ্তার করার আদেশ; নজরুল পালিয়ে চলে গেলেন কুমিল্লায়; সেখান থেকে লেখা পাঠাতে থাকলেন পত্রিকায়। দেওয়ালী সংখ্যায় লিখলেন এক জ্বালাময়ী প্রবন্ধ। এবার পুলিশ হন্যে

হয়ে খুঁজে বের করল তাঁকে। গ্রেপ্তার করল কুমিল্লায়। তারপর নিয়ে এল আলিপুর জেলে।

১৯২৩ সালের ১৫ই জানুয়ারী আলিপুর কোর্টে বিচার হল নজরুলের। ইংরেজ বিচারককে সম্বোধন করে নজরুল বললেন—'যত অত্যাচার উৎপীড়নই আসুক, শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত মাথা উঁচু করে গেয়ে যাব শেকল ভাঙ্গার গান।' এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হল। আলিপুর থেকে তাঁকে নিয়ে গেল হুগলী জেলে। আরো বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী তখন ঐ জেলে। গান, আবৃত্তি, হাসি, হুল্লোড়ে জেলকে মাতিয়ে তুললেন নজরুল। কয়েদীরাও মেতে গেল।

কুকুরের মত ক্ষেপা জেলের কর্তারা নজরুলের হাত থেকে কেড়ে নিল কাগজ কলম। বন্ধ করে দিল বই, পত্রপত্রিকা পড়া। নজরুল মুখে মুখেই বাঁধতে লাগলেন গান, গাইতে লাগলেন গলা ফাটিয়ে। এবার নজরুলকে হাতে কড়া, পায়ে বেড়ী পরিয়ে ছোট একটা নির্জন কুঠরীতে দিনরাত রাখল পুরে। তারই মধ্যে নজরুল সামনের গরাদে হাতের কড়া বাজিয়ে ধরেন গান, আর শত শত কণ্ঠে বন্দীরা মেলায় গলা। সারা জেলে ফুঁসে ওঠে গানের বান। গান যত প্রবল হয় অত্যাচারও বাড়ে তত।

অবশেষে অত্যাচারের প্রতিবাদে অনশন শুরু করেন নজরুল ও অন্যান্য বন্দীরা। নাকে নল পুরে জোর করে খাওয়ানোর চেষ্টা করায় নজরুলের শরীর পড়তে লাগল দ্রুত ভেঙে। দেশময় উঠল প্রতিবাদের ঝড়। শেষ পর্যন্ত বন্দীদের দাবী মেনে নিতে হল সরকারকে। উনচল্লিশ দিন পরে ভঙ্গ হল অনশন।

নজরুলকে এবার নিয়ে যাওয়া হল বহরমপুর জেলে। সেখানেও জেগে ওঠে প্রাণের বন্যা, বন্দীরা ভাঙতে থাকে জেলের শাসন, নজরুলের সাজা বেড়ে যায় আরও এক মাস। অবশেষে তের মাস

জেল খেটে নজরুল পেলেন মুক্তি ! মুক্তি পেয়ে সোজা চলে গেলেন কুমিল্লায়। গানে কবিতায় বক্তৃতায় কুমিল্লাবাসীর প্রাণে বইয়ে দিলেন স্বাধীনতার লড়াইয়ের জোয়ার।

অগ্নিবীণা বাজে

নজরুলের উপর ক্ষেপে উঠল মোল্লা মৌলবী আর পুরোহিত পাণ্ডারা। কারণ—হিন্দু মুসলমান জাতি ভেদাভেদের পাঁচিল গুঁড়িয়ে দিয়ে নজরুল বিয়ে করলেন কুমিল্লার হিন্দু মেয়ে প্রমীলা সেনগুপ্তাকে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, ফজলুল হক ইত্যাদি দেশনেতারা বিবাহবাসরে এসে অভিনন্দন জানালেন কবিকে। প্রমীলা আর তাঁর বিধবা মা গিরিবালা দেবীকে নিয়ে কবি বাসা পাতলেন প্রথমে হুগলী, পরে কৃষ্ণনগর শহরে। প্রথম ছেলের নাম রাখলেন কৃষ্ণ মহম্মদ। এ-সন্তানের মৃত্যু হয়েছিল কয়েক মাস বাদেই। জীবন দিয়ে হিন্দু-মুসলমান মিলনের সাঁকো বাঁধলেন কবি। নজরুলের বাসা হয়ে উঠল কবি সাহিত্যিক আর স্বাধীনতা সৈনিকদের মিলন মন্দির।

আরাম নয়, আয়েস নয়, নিরালায় কবিতা লিখে, গান গেয়ে দিন কাটানো নয়; নজরুল মাথায় তুলে নিলেন স্বাধীনতার মন্ত্রে দেশকে জাগানোর ব্রত। সারা বাংলার গ্রাম থেকে গ্রামে, শহর থেকে শহরে কবি ছুটে বেড়াতে থাকলেন মুক্তির কবিতা গান বক্তৃতা গলায় নিয়ে। সে গান মিঠে গলায় মিন্‌মিনে গান নয়, কলজে-ছেঁড়া প্রাণ জাগানো হাঁক। সে হাঁকে দলে দলে যুবক ঘরের মায়া কাটিয়ে বেরিয়ে পড়তে থাকে লড়াই-এর মাঠে। ছুটতে ছুটতে কবির দেহ হয় অবসন্ন, কণ্ঠ হয় ক্ষতবিক্ষত; তবু থামে না চলা। মুক্তি সেনানীদের কাছ থেকে ডাক এলে আর স্থির থাকতে পারেন না কবি। চলে যান তাদের সাথে। কবিকে পেয়ে তারা আর ছাড়তে চায় না। দিনের পর দিন থাকতে হয় তাদের মধ্যে। তাঁকে ঘিরে গর্জে ওঠে প্রাণের সাগর।

তারকেশ্বর মন্দিরের মোহান্তের অত্যাচার অনাচারের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহের ডাক দিয়েছেন বাংলার নেতারা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কবির উপর দিলেন প্রচারের ভার। কবি বাঁধলেন মোহ-অন্তের গান; গ্রাম শহরে সেই গান গেয়ে, সভা করে হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করলেন। সত্যাগ্রহের আগে বিরাট সভা আরম্ভ হ'ল মন্দিরের পাশের মাঠে। দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি নেতারা এসে বসলেন মঞ্চে। এদিকে মোহান্তের হাজারখানেক লেঠেল ঘিরে ফেলেছে সভা। লেঠেল-দের নেতা সত্য বাঁড়ুজ্জে মঞ্চের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে মারমুখী হয়ে। দারুণ হিংস্র লোক সে। কত মানুষকে যে খুন করেছে তার হিসেব নেই। থমথমে সভায় চিত্তরঞ্জন নজরুলকে বললেন গান গেয়ে সভা শুরু করতে। নজরুল আগুন ঝরানো গলায় সুরু করলেন মোহ-অন্তের গান। গান শেষ হতেই হঠাৎ সত্য বাঁড়ুজ্জে বলে উঠল—কাজী, আবার গাও গানটা। কাজী আবার ধরলেন। গানের শেষে সত্য বাঁড়ুজ্জে ধীরে ধীরে উঠে এলো মঞ্চে, দেশবন্ধুর পায়ের তলায় রেখে দিল তার রক্তের দাগধরা লাঠি; বলল—আজ থেকে আমি মোহান্তের শত্রু, আপনার স্বেচ্ছাসেবক।

এরই মধ্যে চলে অনর্গল কবিতা, গান, গল্প লেখা। কিন্তু তাতে আয় হয় ক'পয়সা। তাই অভাব অনটন হয়ে উঠতে থাকে সাংঘাতিক। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই কবির। আকাশ ফাটানো হাসি আর প্রাণ মাতানো গানেরও নেই বিরাম। দিনরাত বাড়ীতে বইতে থাকে মানুষের স্রোত। আদর আপ্যায়নেও নেই ত্রুটি। নিজেরা উপোস করেও অতিথিকে খাওয়ান। এইভাবে দেড় বছর হুগলীতে কাটিয়ে কবি চলে এলেন কৃষ্ণনগরে। এখানে এসেও সেই একই জীবন; আজ ফরিদপুর, কাল চট্টগ্রাম, পরশু বাঁকুড়া—সারা বাংলার সভায় সম্মেলনে দিনের পর দিন কেটে যায়।

সুরের আগুনে

দেশের মধ্যে তখন শুরু হয়েছে হিন্দু-মুসলমান ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি কাটাকাটি। নেতাদের মধ্যেও লেগেছে ঝগড়া বিবাদ। স্বাধীনতা আন্দোলনের চারণ কবি এই সময়ে গেয়ে উঠলেন—'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার।' দেশনেতাদের ডাক দিয়ে বারবার বললেন—'করে হানাহানি তবু চলো টানি নিয়াছ যে মহাভার।' যুবসম্মেলনে কবি গাইলেন—ছাত্রদলের গান; প্রজা সম্মেলনে গাইলেন শ্রমিকের গান।

কিন্তু কবি তো শুধুমাত্র দেশের স্বাধীনতা চান না। তাঁর প্রাণে যে সর্বক্ষণ বাজে 'উৎপীড়নের ক্রন্দন রোল'; তিনি যে আকাশ ফাটিয়ে বলেন—'যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটির মুখের গ্রাস যেন লেখা হয় আমার রক্তলেখায় তাদের সর্বনাশ'। তাই কবি পুরোনো বন্ধু মুজফ্ফর ইত্যাদির সাথে মিলে গড়লেন শ্রমিক কৃষক দল। এই দলের হয়ে বের করলেন 'লাঙল পত্রিকা'। লাঙলে প্রকাশিত হল তাঁর বিখ্যাত 'সাম্যবাদী' কবিতাগুলি।

এদিকে কৃষ্ণনগরে থাকতে থাকতেই কবি ঢুকে পড়েছেন সুরের মায়াপুরীতে। দু'বছর কৃষ্ণনগরে থেকে কবি যখন কলকাতায় এলেন তখন সুরের বান ডেকেছে তাঁর কণ্ঠে। সুরে কখনও ফুটছে ফাগুনের ফুল, কখনও ছুটছে আগুনের ফুলকি। সারা বাংলা দেশ তখন নজরুলের নামে পাগল। গ্রামে-গঞ্জে, ক্ষেতে-খামারেও ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর গান। গ্রামোফোনের সাহেব কোম্পানীগুলোও মোটা লাভের আশায় কবির গান রেকর্ড করার জন্য ব্যস্ত হল। প্রথমে মেগাফোনে পরে হিজ মাস্টারস্ ভয়েসে কবি হলেন সংগীত রচয়িতা ও শিক্ষক। নতুন নতুন সুরে শয়ে শয়ে গান সৃষ্টি করে চললেন কাজী নজরুল ইসলাম। মুখে পান আর গলায় গান নিয়েই মেতে রইলেন। অর্থেরও রইল না আর অভাব।

যুদ্ধ থেকে ফেরার পর থেকে দশটি বছর ধরে কণ্ঠে ও কলমে আগুন ঝরিয়ে ধূমকেতুর মত ছুটে বেড়ালেন কবি। বাংলা সাহিত্যের ফুল বাগানে ফোটালেন আগুনের রঙ। লিখলেন—অগ্নিবীণা, দোলনচাঁপা, বিষের বাঁশি, ভাঙার গান, ছায়ানট, সাম্যবাদী, সর্বহারা, ফণীমনসা, ঝিঙেফুল, প্রলয়শিখা ইত্যাদি কবিতার বই ছাড়াও অনেকগুলি গল্প, উপন্যাস, নাটক, আর অজস্র গান। থিয়েটার, সিনেমা ইত্যাদিতেও সুর দিলেন, গান দিলেন। তাঁর কবিতার বই বিষের বাঁশি, ভাঙার গান, প্রলয়শিখা আর গানের বই চন্দ্রবিন্দু নিষিদ্ধ করে দিল ইংরেজ সরকার।

অকাল সন্ধ্যা

প্রাণের জোয়ারে টলমল কবির বুকে হঠাৎ শেল বিদ্ধ হল ১৯৩০ সালে। তাঁর অতি প্রিয় সন্তান বুলবুলের মৃত্যু হল বসন্ত রোগে। সদানন্দ কবির মনে ক্রমশঃ নিরানন্দের মেঘ জমতে সুরু করল। অস্থির কবি মনের শান্তি খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। গানের ঝরনা ধারায় চোখের জল মুছে ফেলার চেষ্টায় রত হলেন। রেডিও-তেও গানের আসর পরিচালনার দায়িত্ব পেলেন। এই সময় কিছু কুসংস্কারাচ্ছন্ন বন্ধু তাঁকে ধীরে ধীরে টেনে নিয়ে গেল ধর্মের পথে। একে তো শিশুর মত সরল মন কবির, তার উপর পুত্রশোকে তখন তিনি অত্যন্ত কাতর। তাই সরল বিশ্বাসে কবি ধর্মসাধনার পথ ধরলেন মনের স্বস্তি ফিরে পাওয়ার আশায়। অগ্নিবীণার আগুন গেল নিভে; সুরের আগুন পরিণত হল সুরের কান্নায়। কবি ধর্মের গান লিখে চললেন বিভোর হয়ে। সে-গানেও সুরের সৌন্দর্য কম নয়।

পুত্রের মৃত্যুর কয়েক বছর পরে এল আবার আঘাত। স্ত্রী আক্রান্ত হলেন পক্ষাঘাতে, অসাড় হয়ে গেল তাঁর পা দুটি। হাজার হাজার টাকা খরচ করে চিকিৎসা করিয়েও যখন কিছু হল না, কবি তখন কতিপয়

বন্ধুর উপদেশে পূজো আর্চা, ধ্যান মানত ইত্যাদি করতে থাকলেন। যে তারকেশ্বরে কবি একদিন বিদ্রোহের গর্জন তুলেছিলেন সেই তারকেশ্বরে গিয়ে ধর্ণা দিলেন। দিনের পর দিন শুধু চা আর পান মুখে নিয়ে গান বাঁধেন, সুর দেন, শেখান; তারপর সারাদিনে উপবাসের পর রাতে এক গ্লাস দুধ মাত্র পান করে সারারাত ধরে করেন ধ্যান যোগ যাগ। শরীরের উপর এই ভয়ংকর নির্যাতনের ফলে তাঁর দেহের স্নায়ুগুলি হয়ে পড়তে থাকে বিপর্যস্ত, মস্তিষ্ক হয়ে আসে নিস্তেজ।

১৯৪১ সালের ৭ই আগস্ট কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের যখন মৃত্যু হল নজরুল তখন রেডিও স্টেশনে বসেই লিখে ফেললেন—'রবিহারা' কবিতা; রাতে রেডিওতে সেই কবিতা আবৃত্তি করতে করতে শোকগ্রস্ত কবির জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে গেল, আবৃত্তি হল না শেষ। তবু বছর কাটল। ১৯৪২ সালের ৯ই জুলাই রেডিও স্টেশনেই কবি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। মস্তিষ্ক গেল অসাড় হয়ে। বিয়াল্লিশ বছর বয়সের কবির বলিষ্ঠ শরীরের আর সবকিছু রইল অটুট; কেবল হারিয়ে গেল বোধশক্তি। দেশ বিদেশের চিকিৎসাতেও তা আর এল না ফিরে। এর পরও নির্বাক কবি বেঁচে রইলেন চৌত্রিশ বছর। অবশেষে ১৯৭৬ সালের ২৯শে আগস্ট তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন; স্বাধীনতা সংগ্রামের চারণ কবি নিলেন বিদায়।

অনুশীলনী

মহাকবি মধুসূদন

(ক) শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

১। বাংলার এ যুগের আদিকবির নাম ——। ২। কবি মধুসূদনের জন্ম——সালের——জানুয়ারী। ৩। তাঁর বাবার নাম——। ৪। তাঁর মায়ের নাম——দেবী। ৫। তাঁর জন্মস্থান——জেলার——গ্রামে। ৬। খৃষ্টান হওয়ার আগে মধু পড়তেন——কলেজে। ৭। খৃষ্টান হওয়ার পরে তিনি পড়তেন—কলেজে। ৮। মধু অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রথম লেখেন—কাব্য। ৯। মধুর লেখা প্রথম নাটকের নাম——। ১০। মধুর মৃত্যু হয়——সালের——জুন।

(খ) বন্ধনীর মধ্যে অনেকগুলি কথা লেখা আছে ; সঠিক কথাটি শূন্যস্থানে লেখ ঃ

১। সাগরদাঁড়ী গ্রাম——নদীতীরে অবস্থিত। (পদ্মা, যমুনা, কপোতাক্ষ) ২। মধুসূদনের জন্মস্থানটি বর্তমানে——। (পশ্চিমবঙ্গে, ভারতে, বাংলাদেশে, পাকিস্তানে) ৩। মধু খৃষ্টান হয়েছিলেন ----। (বাবার উপর রাগ করে, খৃষ্টান ধর্মকে ভালবেসে, ইংরেজী ভাষার কবি হওয়ার জন্য) ৪। বাংলা ভাষায় মধু প্রথম লিখেছিলেন——। (গল্প, নাটক, উপন্যাস, কাব্য) ৫। খৃষ্টান হওয়ার পর বিপদে পড়ে মধু——চলে গিয়েছিলেন। (কাশ্মীর, সাগর দাঁড়ি, মাদ্রাজ) ৬। মাদ্রাজে গিয়ে মধু হয়েছিলেন——। (শিক্ষক, কেরানী, গায়ক, উকিল) ৭। ছাত্র জীবনে মধুসূদন খুব ভাল--- শিখেছিলেন। (বাংলা, অংক, ইংরেজি) ৮। মধুর লেখা প্রথম কবিতার বই——। (বীরাঙ্গনা, কৃষ্ণকুমারী, ক্যাপটিভ লেডী, হেক্টরবধ) ৯। মধু বিলেতে গিয়েছিলেন——। (ভ্রমণ করতে, ব্যারিস্টারী পড়তে, কবি হতে)।

(গ) প্রশ্নগুলির উত্তর লেখ ঃ

১। কোন্ বই লেখার জন্য মধুসূদনকে আদিকবি বলা হয়েছিল ? ২। কালীপ্রসন্ন সিংহ কে ? ৩। মায়ের কাছ থেকে মধু কোন্ কবিতা শুনতেন ? ৪। সাহেবী স্কুলে পড়বার সময় তাঁর কী ভাল লেগেছিল। ৫। কে মধুর মনে কবিতার নেশা ধরিয়েছিলেন ? ৬। হিন্দু কলেজের পড়া মধু শেষ করতে পারেননি কেন ? ৭। মধু মাদ্রাজে গিয়েছিলেন কেন ? ৮। লালবাজারের পুলিশ আদালতে মধু কিসের চাকরী পেয়েছিলেন ? ৯। 'শর্মিষ্ঠা' কোন্ রঙ্গমঞ্চে কাঁরা অভিনয় করেছিলেন ? ১০। 'বীরাঙ্গনা' কোন্ ছন্দে লেখা ? ১১। মধুসূদনের চারখানা কবিতার বই-এর নাম বল।

১২। মধুসূদনের প্রহসন দুটির নাম কি? ১৩। ফরাসী দেশে বসে মধু কি ধরনের কবিতা লিখেছিলেন? ১৪। কার কোন্ নাটক অনুবাদ করার জন্য মধুর উপর সাহেবরা ক্ষেপেছিল? ১৫। মধুসূদন কোন্ কোন্ ভাষায় লিখতে পড়তে জানতেন? ১৬। মধুসূদনের মৃত্যু হয়েছিল কোথায়?

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র

(ক) শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম হয়েছিল —— খৃষ্টাব্দের —— জুন। ২। তাঁর জন্মস্থান ——জেলার——গ্রাম। ৩। বঙ্কিমের ইংরেজি পড়া শুরু হয়েছিল——স্কুলে। ৪। সাড়ে এগার বছর বয়সে বঙ্কিম ভর্তি হয়েছিলেন ——এ। ৫। বঙ্কিমের কবিতা লেখার গুরু ছিলেন——। ৬। তাঁর লেখা কবিতার বই-এর নাম ——। ৭। ——বছর বয়সে বঙ্কিম পেয়েছিলেন ——এর চাকরী। ৮। খুলনার হাকিম হয়ে তিনি শায়েস্তা করেছিলেন —— সাহেবদের। ৯। বঙ্কিমের প্রথম উপন্যাসের নাম ——। ১০। বঙ্কিম——পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। ১১। বঙ্কিমের——উপন্যাসখানি চলতিকালের মানুষকে নিয়ে লেখা। ১২। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু হয়——খৃষ্টাব্দের——এপ্রিল।

(খ) বন্ধনীর ভেতর থেকে সঠিক কথাটি বেছে নিয়ে শূন্যস্থানে বসাও :

১। অ, আ, ক, খ শিখতে বঙ্কিমের—দিন লেগেছিল। (সাত, এক, অনেক) ২। ঝড়ের সময় নৌকো চড়তে বঙ্কিম—পেতেন। (ভয়, আনন্দ) ৩। কলেজ থেকে ফিরে বঙ্কিম বেড়াতে যেতেন —। (খেলার মাঠে, গঙ্গার পাড়ে, খালের ধারে) ৪। প্রেসিডেন্সি কলেজে বঙ্কিম পড়তেন——। (বিজ্ঞান, আইন, সাহিত্য) ৫। বঙ্কিম প্রথম চাকরী করতে যান——। (যশোরে, খুলনায়, কাঁথিতে) ৬। বন্দেমাতরম্ গানটি আছে ——বই-এ। (বিষবৃক্ষ, আনন্দমঠ, মৃণালিনী)।

(গ) বাঁ পাশ থেকে ঠিক ঠিক কথা বেছে নিয়ে ডান পাশের শূন্যস্থান পূর্ণ কর :

১। ছেলেবেলায় বঙ্কিমের নাম হয়েছিল ——	সীতারাম
২। বঙ্কিমের প্রকাশিত পত্রিকার নাম ——	কপালকুণ্ডলা
৩। বঙ্কিমের শেষ উপন্যাস——	বাঁকা
৪। বঙ্কিমের বাবার নাম——	রমেশচন্দ্র
৫। বঙ্কিমের দ্বিতীয় উপন্যাসের নাম——	বঙ্গদর্শন
৬। বঙ্কিমের শিষ্য ছিলেন——	যাদবচন্দ্র

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ

(ক) প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ

১। রবীন্দ্রনাথের জন্ম কবে কোথায়? ২। রবীন্দ্রনাথের বাবার নাম কি? ৩। কলকাতার কোন্ কোন্ স্কুলে রবীন্দ্রনাথ পড়েছিলেন? ৪। বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথ বাইরের জগৎকে কিভাবে দেখতেন? ৫। একেবারে ছোটবেলায় রবীন্দ্রনাথের শিক্ষক ছিলেন কে? ৬। ব্রজেশ্বর কে? সে বালক রবিকে কি শোনাত? ৭। লেখাপড়া ছাড়া বালক রবিকে আর কি কি শিখতে হত? ৮। কে কিভাবে বালক রবির ঘরের গণ্ডী ঘুচিয়ে দিয়েছিলেন? ৯। কত বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ কবিতা লেখা স্থরু করেছিলেন? ১০। স্কুল ছেড়ে রবি কাদের সঙ্গ নিয়েছিল? ১১। দেশকে ভালবাসার শিক্ষা রবি কিভাবে পেয়েছিল? ১২। রবীন্দ্রনাথের মনে কবিতাই জীবনের লক্ষ্য হয়ে উঠল কিভাবে? ১৩। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ কি করেছিলেন? ১৪। কোন্ বই-এর জন্য রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন? ১৫। কতবছর বয়স পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখেছিলেন?

(খ) শূন্যস্থান পুরণ কর ঃ

১। জ্ঞানবাবু বালক রবিকে——অনুবাদ করিয়েছিলেন। ২। সত্যেন্দ্রনাথ রবিকে বিলেতে নিয়ে গিয়েছিলেন——পড়াতে। ৩। চন্দননগরে জ্যোতিদার বাসায় থাকার সময় রবীন্দ্রনাথ——এর কবিতা লিখেছিলেন। ৪। ——এ দু'টি ছেলেকে নিয়ে কবি প্রতিষ্ঠা করেন——। ৫। ষাট থেকে সত্তর বছর বয়সের মধ্যে কবি——কাটিয়েছিলেন বিদেশে। ৬। নিজের বই-এর সব আয় কবি দিয়ে দিয়েছিলেন——কে। ৭। রবীন্দ্রনাথ 'স্যার' উপাধি পরিত্যাগ করেছিলেন——হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে। ৮। ——বছর ধরে রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখেছিলেন।

(গ) পরিচয়গুলি ওলট পালট করে লেখা আছে বাঁ পাশে ; ডান পাশে ঠিক ঠিক জায়গায় সেগুলি বসাও ঃ

১। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ	বড়দা	৫। হেমেন্দ্রনাথ	খুড়তুতো দাদা
২। গুণেন্দ্রনাথ	খাজাঞ্চি	৬। বিহারীলাল চক্রবর্তী	ভাগ্‌নে
৩। দ্বিজেন্দ্রনাথ	সেজদা	৭। কিশোরী চাটুয্যে	কবি
৪। সত্যপ্রসাদ	জ্যোতি দাদা		

১। ডাকঘর	শিশু কবিতা	৫। গল্পগুচ্ছ	কাব্য
২। খেয়া	গল্প	৬। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ	উপন্যাস

৩। ঘরে বাইরে গানের বই ৭। গীতবিতান কবিতা
৪। ছড়ার ছবি নাটক

প্রিয়তম লেখক শরৎচন্দ্র

(ক) শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

১। শরৎচন্দ্রের বাল্য নাম ——। ২। শরৎচন্দ্রের জন্ম —— গ্রামে। ৩। শরৎচন্দ্র পাঁচ বছর বয়সে ভর্তি হয়েছিলেন —— এর পাঠশালায়। ৪। শরৎচন্দ্র —— তে গিয়ে ফাঁস এঁটে গিরগিটি ধরতেন। ৫। শরৎচন্দ্রের মামার বাড়ী——। ৬। শরৎচন্দ্র দেবানন্দপুরে একবার —— এর সাথে পালিয়ে গিয়েছিলেন। ৭। শরৎচন্দ্র অভিনয় করতেন——ক্লাবে। ৮। শরৎচন্দ্র লেখায় হাত দেন——এর বাড়ীতে বসে। ৯। শরৎচন্দ্র পিতার মৃত্যু সংবাদ পান —এ। ১০। শরৎচন্দ্র ব্রহ্মদেশে বাসা করেছিলেন —— বস্তিতে। ১১। শরৎচন্দ্রের প্রথম মুদ্রিত গল্প ——। ১২। শরৎচন্দ্র ব্রহ্মদেশে কাটিয়েছিলেন —— বছর। ১৩। শেষজীবনে তিনি বাড়ী করেছিলেন —— গ্রামে। ১৪। শরৎচন্দ্রকে ডি. লিট উপাধি দিয়েছিলেন ——।

(খ) প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ

১। কত সালের কত তারিখে শরৎচন্দ্রের জন্ম হয়? ২। তাঁর বাবার নাম কি? ৩। বাবা কি ধরনের লোক ছিলেন? ৪। বালক শরৎচন্দ্র বৈরাগীর আখড়ায় পালিয়ে গিয়েছিলেন কেন? ৫। দেবানন্দপুরে ন্যাড়ার দলের আস্তানা ছিল কোথায়? সেখানে তারা কি করত? ৬। দেবানন্দপুরে থাকতে পড়ার ঝোঁকে তিনি কি করতেন? না ঘুমিয়ে রাত কাটাতেন কেন? ৭। শরৎচন্দ্র স্কুল কলেজে কোন্ পর্যন্ত পড়েছিলেন? আরও বেশী পড়তে পারেন নি কেন? ৮। ভাগলপুরে তার তিন বন্ধু ছিলেন কে কে? ৯। পুলিশ সাহেবকে তারা মেরেছিলেন কেন? কিভাবে মেরেছিলেন? ১০। পুঁটুদের বাড়ীতে বসে শরৎচন্দ্র কোন্ কোন্ গল্প লিখেছিলেন? ১১। কত সালে শরৎচন্দ্র ব্রহ্মদেশে পাড়ি দিয়েছিলেন? ১২। কে তাকে রেঙ্গুন রত্ন উপাধি দিয়েছিলেন? কেন দিয়েছিলেন? ১৩। শরৎচন্দ্রের স্ত্রীর নাম কি? ১৪। শরৎচন্দ্র স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন কোন্ সালে? ১৫। শরৎচন্দ্র কাদের সাথে কেন মামলা লড়েছিলেন? ১৬। শরৎচন্দ্রের মৃত্যু হয় কবে? ১৭। শরৎচন্দ্র সামতার দাদাঠাকুর হয়েছিলেন কেন?

(গ) বাঁ পাশের কথাগুলিকে ঠিক ঠিক ভাবে সাজাও ঃ

১। শরৎচন্দ্রের প্রথম মুদ্রিত গল্প শ্রীকান্ত
২। ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথম গল্প বিরাজ বৌ

৩। ব্রহ্মদেশ থেকে লিখে পাঠান প্রথম গল্প — মন্দির
৪। সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ করা উপন্যাস — বড়দিদি
৫। নিজের জীবনকে নিয়ে লেখা উপন্যাস — রামের সুমতি
৬। ব্রহ্মদেশ থেকে লিখে পাঠান প্রথম উপন্যাস — পথের দাবী

বিদ্রোহী কবি নজরুল

(ক) প্রশ্নগুলির উত্তর বল ঃ

১। নজরুলের বাবার নাম কি ? ২। বালক নজরুল কোন্ গানের দলে গান গাইতেন ? ৩। বালক নজরুলের গানের গুরু ছিলেন কে ? ৪। নজরুলের নাম দুখু হয়েছিল কেন ? ৫। নজরুলের গান লেখার ঝোঁক এসেছিল কার প্রভাবে ? ৬। গ্রামের মক্তবে নজরুল কোন্ পরীক্ষায় পাশ করেছিলেন ? ৭। রুটির দোকানে নজরুল কি রকম ব্যবহার পেতেন ? ৮। মৈমনসিং-এ নজরুল গেলেন কিভাবে ? সেখানে তিনি কোন্ স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন ? ৯। রাণীগঞ্জের কোন্ স্কুলে তিনি পড়তেন ? ১০। নজরুল দেশপ্রেমের দীক্ষা পেয়েছিলেন কার কাছে ? ১১। নজরুল যুদ্ধে গিয়েছিলেন কেন ? ১২। সৈন্য-দল ছেড়ে আসার পর নজরুল কার কাছে উঠেছিলেন ? ১৩। প্রথম কোন্ পত্রিকা তিনি প্রকাশ করেছিলেন ? ১৪। কোন্ কবিতা লেখার জন্য নজরুলকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল ? ১৫। কোন্ জেলে নজরুল অনশন করেছিলেন ? ১৬। জেল কর্তৃপক্ষ তাঁর উপর ক্ষেপেছিল কেন ? ১৭। নজরুল বিয়ে করে-ছিলেন কাকে ? ১৮। নজরুল কিভাবে দেশবাসীকে স্বাধীনতার লড়াই-এ উদ্বুদ্ধ করতেন ? ১৯। সত্য বাঁড়ুজ্জে মোহান্তের পক্ষ ত্যাগ করেছিলেন কেন ? ২০। নজরুল গানের শিক্ষক হয়েছিলেন কোথায় ? ২১। কোন্ কোন্ আঘাতে তাঁর মনের শান্তি নষ্ট হয়েছিল ?

(খ) শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

১। নজরুলের জন্ম——জেলার——গ্রামে। ২। তাঁর জন্মের সাল——তারিখ——। ৩। শিয়াড়শোল স্কুলে পড়ার সময় তাঁর বন্ধু ছিল——। ৪। স্কুলে নজরুল——পর্যন্ত পড়েছিলেন। ৫। সেনাদলে ভর্তি হয়ে নজরুল গিয়েছিলেন —। ৬। পাঞ্জাবী মৌলবীর কাছে নজরুল পড়েছিলেন—এর কাব্য। ৭। তিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন——কবিতাটি লিখে। ৮। কারারুদ্ধ নজরুলকে রবীন্দ্রনাথ উৎসর্গ করেছিলেন—গীতিনাট্যখানি। ৯। হিন্দু মুসলমান মারামারির সময় নজরুল গেয়েছিলেন—। ১০। লাঙল পত্রিকায় নজরুল লিখেছিলেন—কবিতাগুলি।

মূল্য পাঁচ টাকা